ভেতরে

শিক্ষক দিবস হাইজ্যাক করলেন মোদী ... ২
দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ৩
জে এন ইউ তে আইসার বিপুল জয় ... ৪
বিরাট ব্যাঙ্ক ডাকাতি ৫
বিলগ্নিকরণ—কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার ৬
শ্রদ্ধাঞ্জলি—শোক সংবাদ—শহীদ স্মরণ ... ৭

আজকের দেশব্রতী

₹৩

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১৫০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৮০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২১ সংখ্যা ৩১ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূলী হামলা

পুলিশী তাণ্ডব

আহত রক্তাক্ত ৩৮ জন ছাত্রছাত্রী গ্রেপ্তার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তাক্ত হল ক্যাম্পাস গণতন্ত্র, ছাত্রী নিগ্রহের এক গুরুতর ঘটনাকে ন্যক্কারজনকভাবে ধামাচাপা দেওয়া, উল্টে আক্রান্ত ছাত্রীকেই দোষারোপ করা, তদন্তের নামে প্রহসন চালিয়ে দোষীদের রক্ষা করা, পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকা, সাধারণ ছাত্রদের প্রতি তৃণমূলের লুম্পেন বাহিনীর পাণ্ডা 'ছাত্র নেতা'র হুমকী এইসব ঘটনাবলী যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীদের চলমান আন্দোলনে এক বিস্ফোরক অবস্থা সৃষ্টি করে। অপমানের জবাব দিতে, ন্যায় বিচারের দাবিতে, পিতৃতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে শত শত ছাত্রছাত্রী সমবেত হয়, ই সি বৈঠকে সামিল থাকা কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ঘেরাও আন্দোলনে কলা বিভাগের সাথে কারিগর বিভাগের ছাত্ররাও সামিল হয়; নতুন করে তদন্ত কমিটি গঠন করার দাবিতে গড়ে ওঠে দৃঢ়পণ সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য।

কিন্তু তৃণমূলী মাতব্বররা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ-প্রশাসনের সাথে যোগসাজশ করে ক্যাম্পাসকে যেন ছাত্রবিরোধী এক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে। ঘেরাও অবস্থানে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের ওপর কতিপয় 'মাসলম্যান' কর্মচারী, বাইরে থেকে যাওয়া তৃণমূলীগুণ্ডারা মিলিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ চালায়, সুপরিকল্পিতভাবে ভবনের আলো নিভিয়ে অন্ধকার করে দেয়, ছাত্রীদের পোশাক ছিঁড়ে লাঞ্ছনা করে; এই ঘৃণ্য আক্রমণের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কয়েকশত পুলিশ বাহিনী, র‍্যাফ সহ জলকামান। মধ্য রাতের কালো অন্ধকারে উপাচার্যকে তৃণমূলীগুণ্ডারা 'ঘেরাও মুক্ত' করে বাইরে নিয়ে যায়। এরপরই পুলিশ ছাত্রছাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠিচার্জ করে। দীর্ঘক্ষণ ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দয়ভাবে লাঠি পেটা করা হয়। অথচ কোন মহিলা পুলিশ সেখানে ছিল না। এরপর আহত রক্তাক্ত ৩৫ জন ছাত্রছাত্রীকে গ্রেপ্তার করে লালবাজারের নিরাপদ দূরত্বে সেন্ট্রাল লকআপে আটকে রাখা হয়। গ্রেপ্তার হন আইসার সম্পাদক রণজয়, যাদবপুরের ছাত্র সংগঠক অভিষেক, সুধন্যা, ইপ্সিতা। শরীরে চরম আঘাতের যন্ত্রনায় পড়ে থাকে সৈকত, শুভদীপ। পরবর্তীতে কেপিসি হাসপাতালে ভর্তি হয় প্রসেনজিৎ, শিবম, সুমন, সাহানা। কিন্তু শাসকেরা পাথর তোলে নিজের পায়ে ফেলার জন্যই। এই হামলায় গড়ে উঠেছে অভূতপূর্ব ছাত্র জাগরণ। "অধিকার বুঝে নেওয়া প্রখর দাবিতে সারা রাত জেগে থাকা লড়াকু ছবিতে" শুরু হয়েছে ছাত্রদের প্রতিরোধ। চলছে পথ অবরোধ, দীর্ঘ মিছিলে সামিল হয়েছে প্রেসিডেন্সী সহ বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা। বিশ্ববদ্যালয়ের অধ্যাপক সমাজও প্রতিবাদে সামিল। লালবাজার থেকে তাঁরাই মুক্ত করে এনেছেন ধৃত ছাত্রছাত্রীদের।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ এক বিবৃতিতে বলেন, "ন্যায় বিচারের দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা আক্রান্ত হল, ক্যাম্পাসের গণতন্ত্র ধূলায় মিশিয়ে গেল। এক নিগৃহীতা ও যৌন হেনস্থার শিকার ছাত্রীর অভিযোগের তদন্তকে ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তী তাঁর কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং ছাত্র আন্দোলনকে 'শায়েস্তা' করতে পুলিশী হামলা নামিয়েছেন। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়কে 'রাজনীতিমুক্ত' করতে মুখ্যমন্ত্রীর কল্পকথা তাঁরই মনোনীত প্রতিনিধিরা হাওয়ায় মিলিয়ে দিয়েছে, তাদের সহযোগী উর্দীপরা কিছু মানুষ ও চপ্পল পরিহিত স্থানীয় দুষ্কৃতিরা। এ লড়াই ন্যায় বিচারের দাবিতে জারী থাকবে। ক্যাম্পাস গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে। রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে আবেদন ছাত্রছাত্রীদের পাশে গণতন্ত্রর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হোন।"

রাজ্যপালের কাছে সি পি আই (এম এল) পলিটব্যুরো সদস্য কার্তিক পালের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল সাক্ষাত করে স্মারকলিপি জমা দেয়। দাবি জানানো হয়—

(১) ছাত্রছাত্রীদের দাবি মেনে যৌন হেনস্থার শিকার হওয়া ছাত্রীর ঘটনায় উপাচার্যকে এক নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে।

(২) আপনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অবিলম্বে এক উচ্চস্তরের তদন্ত শুরু হওয়া প্রয়োজন, ঐ তদন্তের আওতায় আনতে হবে সমস্ত সমাজবিরোধী, পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য জড়িত সকলকেই।

(৩) হেনস্থার ঘটনায় দোষী পুলিশ কর্তৃপক্ষ সহ সমস্ত অপরাধীদের অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে।

(৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ গণতন্ত্র ও স্বায়ত্ততা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং পুলিশকে যে কোন হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখতে হবে।

- জয়তু দেশমুখ

সারদাকাণ্ডে গ্রেপ্তার চাই!

শিলিগুড়িতে ধিক্কার মিছিল। জেলাওয়াড়ি রিপোর্ট তিনের পাতায়।

ধুবুলিয়া থানায় আর ওয়াই এ-র বিক্ষোভ ডেপুটেশন

গত ১৬ সেপ্টেম্বর আর ওয়াই এ বিক্ষোভ ডেপুটেশন সংগঠিত করেছে। (১) সারদা কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত নেতা মন্ত্রীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। (২) চরমহৎপুর গ্রামে কমরেড ইউসুফ মোল্লার হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও ধুবুলিয়া থানা এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে পরপর কয়েকটি খুনের আসামীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। (৩) বেআইনি জুয়ার আসর ও মদের দোকান বন্ধ করতে হবে। (৪) ধুবুলিয়া ও বাহাদুরপুরে অবৈধ দেহ ব্যবসা এবং তাকে ঘিরে বেড়ে ওঠা সমাজবিরোধী দৌরাত্ম বন্ধ করতে হবে। (৫) বেআইনি গরু পাচার বন্ধ করতে হবে এবং (৬) শাসক দলের প্রভাবমুক্ত হয়ে ধুবুলিয়া থানাকে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে হবে, ইত্যাদি দাবিতে থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সারা রাজ্যের মতই ধুবুলিয়াতেও তৃণমূল আশ্রিত সমাজবিরোধীরা সমগ্র এলাকা জুড়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। সমস্ত কিছু জেনেও পুলিশ-প্রশাসন সম্পূর্ণ নির্বিকার। উপরন্তু তৃণমূল নেতা, সমাজবিরোধী এবং পুলিশের মধ্যে একটা অশুভ আঁতাত গড়ে উঠেছে। ধুবুলিয়া থানা এলাকায় পরপর কয়েকটি খুন হয়ে গেল। খুনিরা তৃণমূল আশ্রিত হওয়ার কারণে এখন পর্যন্ত একজন খুনিও ধরা পড়েনি, উল্টে যারা এই খুনগুলোর প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নেমেছিল তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ভরে দেওয়া হয়েছে। গরু পাচার, অবৈধ দেহ ব্যবসা সমস্ত কিছু থেকে তৃণমূলের নেতারা এবং পুলিশ মোটা টাকা আদায় করছে। তৃণমূল নেতা এবং পুলিশের প্রত্যক্ষ মদতে একের পর এক জুয়ার আসর এবং মদের দোকান খোলা হচ্ছে। এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যে প্রতিদিনই ক্ষোভ বাড়ছে। যুব সংগঠন আর ওয়াই এ-র পক্ষ থেকে ধুবুলিয়া থানায় বিক্ষোভ এবং ডেপুটেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যুব সংগঠনের কর্মীরা এই বিক্ষোভ ডেপুটেশনকে সংগঠিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিন শতাধিক জনতাকে নিয়ে গিয়ে ধুবুলিয়া থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় ও ধুবুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। বিক্ষোভ ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন বিকাশ মণ্ডল, অমিত মণ্ডল, সন্তু ভট্টাচার্য এবং বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম এল)-এর পক্ষ থেকে আনছারুল হক, ঠাণ্ডু সেখ, মহিদুল মোল্লা এবং সুবিমল সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

পত্রিকা সম্পাদকের সংযোজন ঃ **যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সাবাশ!**

ছাত্রদের গণতান্ত্রিক দাবিগুলোর প্রশ্নে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি সি-র আচরণ ঠিক যেন থানার ও সি-র মতন!

মমতা সরকারের পুলিশ অগত্যা বাধ্য হয়ে ধৃত ছাত্রদের আপাত মুক্তি দিয়েছে বটে, ছাত্র বিক্ষোভের দাবিগুলোর এখনও ফয়সালা হওয়া বাকী রয়েছে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে টি এম সি গুন্ডাদল আর পুলিশ বাহিনীর তান্ডবের সাফাই গাইছেন। টি এম সি পি-র পান্ডা দেবের ভূমিকায় এখন খোদ শিক্ষামন্ত্রী। ইয়েস-ম্যাডামের দৌরাত্ম দেখাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী-পুলিশমন্ত্রীর বিশেষ নেকনজরে থাকতে। "আইসা" তাই দাবি তুলেছে শিক্ষামন্ত্রীকে অবশ্যই ক্ষমা চাইতে হবে। প্রতিবাদ যখন আছড়ে পড়ছে তখন মুখ্যমন্ত্রী 'নবান্ন'-তে পূজাবকাশের ভোগ উপভোগে আমলা-গামলা সহ মহানন্দে! পাল্টা জুৎসই জবাব দিতে ছাত্ররা ফের ১৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে পথে নামলেন। মিছিল শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস চত্বর থেকেই, পথ হেঁটেছে গোলপার্ক পর্যন্ত। কন্ঠ আর কদম

আটের পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয়

উপনির্বাচন ফলাফল ঃ বৈপরীত্যের ধামাকা

উপনির্বাচন একপ্রস্থ হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গে ২টি বিধানসভা কেন্দ্র সহ দেশের ৮টি রাজ্যে মোট ৩২টি বিধানসভা কেন্দ্রে। একইসাথে ৩টি রাজ্যে ৩টি লোকসভা কেন্দ্রেও। লোকসভা কেন্দ্র তিনটির উপনির্বাচনী গণরায়ে ১টি করে আসন জিতেছে মূলত যে দল যে রাজ্যে ক্ষমতায় তারা। উত্তরপ্রদেশে মৈনপুরী কেন্দ্রে জিতেছে মুলায়ম-অখিলেশ যাদবদের সমাজবাদী পার্টি। গুজরাটে বদোদরা পেয়েছে মোদীর দল বিজেপি। আর, তেলেঙ্গানায় মেডক জিতেছে টি আর এস।

তবে মূলত বিধানসভা উপনির্বাচনগুলোর ফলাফলের দিকেই আম দেশ ও জনতার নজর ছিল। কারণ প্রথমত, লোকসভা কেন্দ্রগুলোর তুলনায় বিধানসভা কেন্দ্রগুলো দশগুণ সংখ্যায় বেশী। দ্বিতীয়ত, গত লোকসভা নির্বাচনে মোদী ঝড়ে বিজেপির একক নিরঙ্কুশতা হাসিল হওয়ার পর পরিস্থিতি কেমন প্রবহমান সেটা রাজ্যে রাজ্যে আগে-পরে বিধানসভা উপনির্বাচন-নির্বাচনের দর্পণে যাচাই হওয়ারও রয়েছে। বিশেষ করে, ইতিমধ্যে বিহার ও উত্তরাখণ্ডে বিধানসভা উপনির্বাচনে মোদী ঝড়ের কোনও রেশ অনুভূত না হওয়ায়, বরং বিজেপি কিছুটা ধাক্কাই খাওয়ায়; আর সামনে যখন অপেক্ষায় মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচন—তখন সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা উপনির্বাচনগুলোর ফলাফল যথেষ্ট কৌতূহল-উদ্দীপক ছিল প্রধানত বিজেপিকে কেন্দ্র করে। সেখানে লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ছে বিজেপি সামগ্রিক বিচারে উত্তরোত্তর ধাক্কাই খেয়েছে। বিজেপি পেয়েছে সাকুল্যে ১২টি আসন (উত্তরপ্রদেশে ১১টির মধ্যে ৩টি, রাজস্থানে ৪টির মধ্যে ১টি, গুজরাটে ৯টির মধ্যে ৬টি, অসমে ৩টির মধ্যে ১টি এবং পশ্চিমবঙ্গে ২টির মধ্যে ১টি)। সবচেয়ে গুরুতর ধাক্কা খেয়েছে উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে। উত্তরপ্রদেশে এ যাত্রা অমিত শাহ্ ম্যাজিক ফল দিল না। রাজস্থানে শাসন ক্ষমতায় বিজেপির বসুন্ধরা সরকার। কেন্দ্রের মসনদে মোদীতন্ত্র কায়েমের পর গ্রামীণ গরিবদের এন আর ই জি এ কাজের আইনগত অধিকারের ওপর কোপ নামিয়ে নিয়ে আসার প্রথম কসাই যে মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর রাজ্যেই কংগ্রেসের কাছে ৩-১ পার্থক্যে পর্যুদস্ত হতে হল বিজেপিকে। গুজরাটেও কংগ্রেসের দখলে এসেছে ৩টি আসন। অসমে বিজেপি-কংগ্রেস প্রাপ্ত আসন ১টি করে, সমান সমান। লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপকভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার পর বিধানসভা উপনির্বাচনগুলোতে কংগ্রেস যে আবার লক্ষ্যণীয়ভাবে কিছু আসন দখলে ফিরে আসতে পারছে, এটা অন্যদিকে প্রমাণ করে দিচ্ছে, বিজেপি একইসাথে 'কংগ্রেসমুক্ত ভারত গড়ার' শ্লোগান দিয়ে আর কংগ্রেসী দেশদ্রোহী-জনবিরোধী নয়া আর্থিক-শিল্প-বৈদেশিক ও অন্যান্য নীতিগুলোকেই অনুসরণ করার যে রাজনৈতিক জুয়াখেলায় মত্ত হচ্ছে, অনতিবিলম্বেই তার মাশুল মালুম পেতে শুরু করেছে।

নজর ফেরানো যাক ঘরের রাজ্যে দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনী ফলাফলের দিকে। চৌরঙ্গী কেন্দ্রটি থেকে গেল টি এম সি-র দখলে। বসিরহাট দক্ষিণ কেন্দ্রটি পেয়ে গেল বিজেপি। এই সুবাদে বিজেপি এককভাবে এই প্রথমবার রাজ্য বিধানসভায় একটা আসন পেল। চৌরঙ্গী কেন্দ্রটি সুদূর অতীত থেকে বরাবর মূলত কংগ্রেসেরই জেতা আসন, পরবর্তীতে কংগ্রেস ভেঙ্গে টি এম সি তৈরী হওয়ার পর উত্তরাধিকার সূত্রে জোড়াফুলের কংগ্রেসীরাই দখলীস্বত্ত্ব ভোগ করছে। কিন্তু একদা প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বির ঐতিহ্য ছিল যে বামেদের তারা সংখ্যালঘু অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত চৌরঙ্গী কেন্দ্রে এবার সংখ্যালঘু প্রার্থী দিয়েও রয়ে গেলেন বিপর্যয়ের মধ্যেই। এই কেন্দ্রে চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী টি এম সি-র বিপরীতে বিজেপি দ্বিতীয়, কংগ্রেস তৃতীয় এবং সি পি এম হয়েছে চতুর্থ। এই কেন্দ্রে গত লোকসভা ভোটে প্রাপ্ত শতাংশের তুলনায় এবার উপনির্বাচনে ভোট বেড়েছে কেবল টি এম সি-র (বৃদ্ধি ৯.৩৬ শতাংশ), ভোট কমেছে বড় আকারে কংগ্রেসের (হ্রাস ৭.২২ শতাংশ)। বিজেপির ভোট কমেছে অতি সামান্য (০.৮৮ শতাংশ)। সি পি এম থাকছে বিপর্যয়ের স্থিতাবস্থায় (বৃদ্ধি ০.১৫ শতাংশ)। অপরদিকে, বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনী ফলাফল যথেষ্ট বিস্ময়কর বৈপরীত্যে ভরা। বিজয়ীর খাতা খুলেছে বিজেপি, কিন্তু গত লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তার প্রাপ্ত ভোট অনুপাতে এবার বিধানসভা উপনির্বাচনে মেলা ভোট অনেক অনেক কমেছে। ব্যবধান ছিল যেখানে ৩২ হাজার, সেটা এবার কমেছে ২৮ হাজার। আর, কংগ্রেস এবং সি পি এম পেয়েছে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান। ভোট বৃদ্ধি হয়েছে একমাত্র টি এম সি-র, গত লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় ১৩.৩০ শতাংশ। হ্রাস পেয়েছে বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয়েরই যথাক্রমে ০.৯০ ও ০.৭৩ শতাংশ। ভোট সবচেয়ে হ্রাস পেয়েছে বাম প্রার্থীর—৮.০২ শতাংশ। চৌরঙ্গীতে যেখানে মূলত কংগ্রেসের ভোট, সেই তুলনায় বসিরহাট দক্ষিণে মূলত বাম ভোট ঢলেছে টি এম সি-র অনুকূলে। বাম বিপর্যয় থেকে দক্ষিণমুখী মেরুকরণের প্রধান প্রবণতা থেকেই যাচ্ছে। রকমফেরটুকু হল ২০১১-র বিধানসভা পর্যন্ত সেটা ছিল টি এম সি-মুখী, ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে তা মোড় নিয়েছিল টি এম সি-র পরিবর্তে বিজেপি-মুখী। এবার উপনির্বাচনের ফলাফলে আবার দেখা গেল বাম ভোট উল্লেখযোগ্য শতাংশে গড়ালো টি এম সি-মুখী। এছাড়া ক্রিয়াশীল ছিল রাজনীতির অন্তর্নিহিত সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের ধ্বংসাত্মক কৌশল। বিজেপি দুটি কেন্দ্রেই এই মারাত্মক কৌশল প্রয়োগ করেছে। কিন্তু তবু চৌরঙ্গীতে তার স্বার্থসিদ্ধি হয়নি, বসিরহাট দক্ষিণে তা বিরাট বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মাশুল গুণেছে। পক্ষান্তরে, সংখ্যালঘুদের মানসিক প্রতিক্রিয়াকে ফসল হিসেবে পেয়ে গেছে টি এম সি। তবে দুটি কেন্দ্রে হার-জিৎ দুরকম ফলাফল হওয়ায় সারদা কেলেঙ্কারিতে নিজেকে 'ক্লিনচিট' দাবি করার কায়দা তৃণমূল করে উঠতে পারলো না। দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনী ফলাফলে আপাতত এরাজ্যের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিস্থিতিতে মিডিয়ার চর্চায় থাকছে কেন্দ্র-রাজ্যের ক্ষমতাসীন দুটি দক্ষিণপন্থী শাসকদল। বামফ্রন্টভুক্ত বামেদের শক্তি হয় ক্ষয়িষ্ণু অথবা স্থিতাবস্থায়। মিডিয়াতেও সামগ্রিক বামেদের নিয়ে চর্চা অনেক গৌণ করে দেওয়া হচ্ছে।

সব মিলিয়ে নির্মম বাস্তবতা দাবি রাখছে, সংগ্রাম-সমাবেশ-সংগঠনকে শক্তিশালী করে তোলার পথে বামপন্থাকে রাজ্য রাজনীতিতে প্রধান ধারায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

সি পি আই (এম এল)
কেন্দ্রীয় মুখপত্র (মাসিক)
"লিবারেশন"
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১৫০ টাকা

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
হিন্দি কেন্দ্রীয় মুখপত্র (সাপ্তাহিক)
লোকযুদ্ধ
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ঃ ২০০ টাকা

শিক্ষক দিবস হাইজ্যাক করলেন মোদি

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ চেয়েছিলেন তাঁর জন্মদিন শিক্ষক দিবস হিসাবে পালিত হোক—এমন এক দিন যা তাঁর নিজের জন্মদিনের চাইতেও শিক্ষকদের জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত হবে। ২০১৪ সাল পর্যন্ত এমনটাই হচ্ছিল, যখন রাধাকৃষ্ণণের ভাবধারার বিপরীতে গিয়ে মোদি শিক্ষকদের জন্য উৎসর্গ করা একটি দিনকে ২০১৪ সালে তাঁর নিজের সম্পর্কিত একটি দিনে রূপান্তরিত করলেন।

মানব সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে স্কুলগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হল, রাজধানীতে মোদি স্কুলশিশুদের সমাবেশে যে ভাষণ দেবেন এবং আগে থেকে তাদের শিখিয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর যে উত্তর দেবেন তা যাতে সারা দেশের ছাত্ররা দেখতে পায় তার ব্যবস্থা করা। মোদির সময়ের সাথে তাল রাখার জন্য স্কুলগুলিকে শেষ মুহূর্তে তাদের সময় পরিবর্তন করে নিতে হয়। সুতরাং বহু কষ্টে অর্জন করা অবসর, শিথিলতা ও সম্মান উপভোগ করার বদলে মোদির ভাষণ শোনার তড়িঘড়ি ব্যবস্থা করতেই শিক্ষকদের দিনটি ব্যয় করতে হয়।

সারা দেশজুড়ে অত্যন্ত কম মাইনে পাওয়া, পিঠভাঙ্গা পরিশ্রম করা ও ঠিকা ভিত্তিতে নিযুক্ত হাজার হাজার 'পার্শ্ব-শিক্ষক'-দের কাজের নিরাপত্তা, বেতন ও প্রশিক্ষণ ছাড়াই অবমাননাকর ও শোষণমূলক পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হয়। তাঁদের বহুদিনকার দাবির সাথে সঙ্গতি রেখে তাঁদের পরিস্থিতি উন্নত করা বা তাঁদের নিয়মিতকরণের ব্যাপারে মোদি একটি বর্ণও উচ্চারণ করেননি।

মানব সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে বলা হয়েছিল মোদির ভাষণ শোনাটা বাধ্যতামূলক হবে না। কিন্তু সত্যিটা কি ছিল? দিল্লীর স্কুলগুলি সহ বহু স্কুলে ছাত্রদের হুঁশিয়ারি দেওয়া হল যে মোদির ভাষণের ওপর তাদের পরীক্ষা দিতে হবে এবং ছাত্রদের সতর্ক করা হল যে ভাষণ শুনতে না এলে 'কড়া ব্যবস্থা'-র মুখে পড়তে হবে। দিল্লীর শিক্ষা সংক্রান্ত ডাইরেক্টরেট থেকে দিল্লীর স্কুলগুলিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে একটা নির্দেশিকা জারী করা হল ''ব্যবস্থাপনায় যে কোন ধরনের শিথিলতাকে গুরুতর দৃষ্টিতে বিচার করা হবে''।

এইভাবে শিক্ষক দিবস পর্যবসিত হল কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক এক অনুশীলনে। মোদির ভাবমূর্তি নির্মাণের কর্মসূচীতে স্কুলগুলিকে ও ছাত্রদের সামিল করা হল এবং মোদি তাদের ওপর নিজের মতামত চাপিয়ে দিলেন।

ভাষণ ও 'প্রশ্নোত্তর'-টি ছিল একটি রাজনৈতিক অনুশীলনও বটে। শিশুরা মোদিকে যেসব 'প্রশ্ন' করছিল তা স্পষ্টতই ছিল আগে থেকে শিখিয়ে দেওয়া, যাতে তিনি তার একটা সুচিন্তিত রাজনৈতিক উত্তর দিতে পারেন এবং তাঁর ভাষণগুলি থেকে তাঁর পেয়ারের কিছু কিছু শব্দগুচ্ছ বারবার উচ্চারণ করতে পারেন।

এক তথাকথিত 'সরাসরি প্রশ্নোত্তর'-এ বস্তারের এক ছাত্রী প্রধানমন্ত্রীকে বস্তার ও দান্তেওয়াড়ার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করায় মোদি বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংকে প্রশংসা করার একটা সুযোগ পেয়ে যান এবং ''শিক্ষা নিয়ে প্রশ্ন করা এবং সেটাও এমন এক জায়গা থেকে যেখানে মাওবাদীদের হাতে প্রচুর রক্তক্ষয় হয়েছে, তার জন্য মেয়েটির তারিফ করেন''। ঐ একই এলাকায় আদিবাসীদের ফসলকাটার উৎসবের সমাবেশের ওপর সি আর পি এফ-এর গুলিচালনায় খুদে খুদে বালক ও বালিকাদের যে রক্ত ঝরেছিল তা নিয়ে মোদি কোন কথা বলেননি। ২০১২ সালের সারকেগুড়া গণহত্যায় ছুটিতে বাড়ি আসা বাসাগুড়ার সরকারি স্কুলের ছাত্র ১৫ বছর বয়সী কাকা রাহুল ও মাদকাম রামবিলাসকে গুলি করে হত্যা করা হয় ও 'মাওবাদী' তকমা দিয়ে দেওয়া হয়। ১২ বছর বয়সী কাকা সরস্বতীকেও হত্যা করা হয়। একই অঞ্চলে সরকার পরিচালিত স্কুলে ছোট ছোট আদিবাসী স্কুলছাত্রীদের ধর্ষণের ব্যাপারেও মোদি ছিলেন মূক—যে ঘটনাটার জন্য ছত্তিশগড়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'খারাপ গ্রহনক্ষত্র'-কে দায়ী করেছিলেন।

নিজের ভাষণ দেখাকে বাধ্যতামূলক করে মোদি সেই দিনটাকে হাইজ্যাক করে নেন, যাকে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন। ইতিমধ্যে মোদির ভূমিকা লেখা দীননাথ বাত্রার যে সব পাঠ্য বইগুলোকে গুজরাটের স্কুলগুলিতে বাধ্যতামূলক পাঠ্য করা হয়েছে, সেগুলো স্বয়ং ডঃ রাধাকৃষ্ণণকেই হাইজ্যাক করে নিয়ে তাঁকে বর্ণবাদী ধ্যানধারণার মাধ্যম করে তুলেছে। ঐ পাঠ্য বইগুলোতে একটা বর্ণবাদী গল্প তুলে ধরা হয়েছে কিভাবে দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ব্রিটিশদের বলেছিলেন যে সাদা লোকেরা হচ্ছে কম সেঁকা রুটির মত, আর কালোরা পোড়া রুটির মত—সেখানে ভারতীয়রা হচ্ছে ''ঈশ্বরের হাতে রান্না সঠিকভাবে সেঁকা রুটি''।

'শিক্ষক দিবস'-কে মোদি নিজের ভাবমূর্তি তৈরির কার্যক্রম হিসাবে ব্যবহার করায় এবং বাত্রার অবাস্তব ও প্রতিক্রিয়াশীল পাঠ্য বইগুলোকে মোদি বৈধতা দেওয়ায়, ভারতীয় স্কুলগুলিতে 'চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ' করা প্রক্রিয়া একটা নতুন এবং তীব্রতর হয়ে ওঠা পর্যায়ের মধ্যে প্রবেশ করছে। কিন্তু শিক্ষার গেরুয়াকরণ ও বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে এবং ঠিকা ভিত্তিতে নিযুক্ত শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের জন্য লড়াইও সেইসাথে তীব্রতর হয়ে উঠবে।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪)

গণমঞ্চের ২২ সেপ্টেম্বরের কর্মসূচীর সপক্ষে প্রচারসভা

গত ১৩ সেপ্টেম্বর যাদবপুর ৮বি বাসট্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত হল গণমঞ্চের প্রচারসভা। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে আজ যখন তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষ ক্রমশ সোচ্চার হচ্ছেন অপরদিকে বিজেপি বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিয়ে এগিয়ে আসছে, এই অবস্থায় সংগ্রামী বামশক্তিকে নতুন করে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে গঠিত গণমঞ্চের প্রাসঙ্গিকতা প্রচারসভা থেকে তুলে ধরা হয়। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর গণমঞ্চের উদ্যোগে প্রথম কর্মসূচী—বিক্ষোভ মিছিলকে সফল করে তোলার আহ্বান জানিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। গণমঞ্চের আহ্বায়ক রেজ্জাক মোল্লা, সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ, বাসুদেব বসু, লেফট ক্যালেকটিভের প্রসেনজিৎ বসু, র‍্যাডিকাল সোস্যালিস্ট সংগঠনের প্রতীপ নাথ বক্তব্য রাখেন। মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দেশবিরোধী-জনবিরোধী নীতি, রাজ্যে একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় মমতা সরকারের নীরব দর্শকের ভূমিকা, চা বাগানে অনাহার মৃত্যু, সারদা কেলেঙ্কারিতে তৃণমূলের নেতা, সাংসদ, মন্ত্রীদের যুক্ত হয়ে পড়া; ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের ঘটনায় দোষীরা শাস্তি পাচ্ছে না—এই বিষয়গুলো বক্তারা তুলে ধরেন। যাদবপুরের জনবহুল স্থানে আয়োজিত ঐ প্রচারসভা ব্যাপক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সভাপতিত্ব করেন জয়তু দেশমুখ।

দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করুন

এক একটা সময় আসে যখন কিছু শব্দ/শব্দবন্ধ রাজনীতি ও অর্থনীতির জগতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। যেমন *ক্রোনি ক্যাপিটালিজম*। ক্রোনি শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'বন্ধু' বা 'স্বজন'। সরকার ও আমলা বাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন অবৈধ সম্পর্ক তৈরি করে একদল অর্থবান ব্যক্তি বা পুঁজিপতি 'বিশেষ' পারমিট, 'বিশেষ' করছাড়, 'উৎসাহ বর্ধক প্যাকেজ', কোষাগারের টাকা লুঠ, জনগণের অর্থ তছরূপ করে তাদের সম্পদ/পুঁজি অভাবনীয় মাত্রায় বৃদ্ধি করে চলে। সরকারের বিভিন্ন স্তরের মন্ত্রী ও পারিষদবর্গের সঙ্গে এই অসাধু, ফাটকা পুঁজিপতিরা এক *দুষ্ট চক্র* গড়ে তোলে। রাজনীতি ও অর্থনীতির জগতকে এরাই নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালায়। নয়া অর্থনীতির জমানায় এই ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের বাড়বাড়ন্ত এবং তার পরিণতি ১৯৯৭-এ আমরা দেখেছিলাম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার *ব্যাঘ্র অর্থনীতির* মুখ থুবড়ে পড়ার মধ্য দিয়ে। তবে নয়া উদার অর্থনীতির সময়েই শুধু নয়, ১৬০০ এবং ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ অর্থনীতিতে বা আমেরিকা বা জাপানের পুঁজিবাদী অর্থনীতিতেও এই ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের অস্তিত্ব আমরা দেখেছিলাম, তবে এদের বাড়াবাড়ন্ত নিও-লিবারেল অর্থনীতিতেই সবথেকে বেশি দেখা যাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলোতে *স্বৈরাচার* ও *ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের* ঘনিষ্ঠ মেলবন্ধন ও জনগণের গণতন্ত্র ধ্বংস করার অভিযান '৬০, '৭০ দশকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ইন্দোনেশিয়ার লক্ষাধিক কমিউনিস্ট নিধন এই দুষ্টচক্রের হাতেই সংঘটিত হয়েছিল।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এই ধরণের আর এক অর্থনীতি-রাজনীতির রমরমা আমরা দেখেছি ল্যাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে। আঁন্দ্রে গুন্দার ফ্রাংক এই বিশেষ রূপ ও চরিত্রের পুঁজিবাদ নিয়ে বিস্তৃত চর্চা করেছেন তাঁর ''লুম্পেন বুর্জোয়া ও লুম্পেন ডেভেলপমেন্ট'' গ্রন্থে। এই পুঁজিপতিরা 'এলিট না লুম্পেন', 'ফিউডাল না সেমি ফিউডাল', 'ঔপনিবেশিক পুঁজিপতিদের এজেন্ট না স্বাধীন বুর্জোয়া' ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নে অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিতর্ক ও মতপার্থক্য থাকলেও প্রায় সকলেই একমত, এরা *ক্রিমিনাল* বা *অপরাধপ্রবণ*।

আমাদের রাজ্য সহ বিভিন্ন রাজ্যে যে 'পঞ্জি স্কিমওয়ালা'দের আমরা দেখছি, লোকে যাদের চিটফাণ্ডওয়ালা বলছে, তাদের *চরিত্র* নিয়ে যথেষ্ট গুরুত্বসহ গবেষণা ও চর্চা প্রয়োজন। এরা একদিকে যেমন অপরাধপ্রবণ (এবং অপরাধী রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, আমলা, পুলিশ অধিকারিকদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী), অপরদিকে সরকার ও অপরাধী ব্যবসায়ীকুলের এক দুষ্টচক্রও বটে। ২, ৫, ১০ কোটি টাকা নয়, কেউ ১০,০০০ কোটি টাকার দুর্নীতিতে লিপ্ত। কেউবা ২৫,০০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে (যেমন উড়িষ্যার গ্রিণ রে ইন্টারন্যাশনাল)। এ ধরণের রোজভ্যালি, এম পি এস, আইকোর সহ ৭৮টি চিটফাণ্ড বা পঞ্জি স্কিমে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি অবাধে চলেছে এবং চলছে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সেবি বা এস এফ আই ও ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রক সংস্থার নাকের ডগায় ও তাদের আধিকারিকদের সাথে যোগসাজশে এই অপরাধ ও দুর্নীতি চলেছে, এটা জলের থেকেও স্বচ্ছ। এই সমস্ত অপরাধী অর্থলগ্নি সংস্থা এখানে ওখানে কিছু রিসর্ট, হোটেল, আবাসন বানিয়ে নিঃস্ব জনগণকে প্রতারিত করে এবং সরকারি ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পর বারোটা বাজিয়ে তৃণমূল স্তরে জনগণের সঞ্চিত অর্থ আত্মসাৎ করে। এদেরই টাকায় একদল ভুঁইফোড় রাজনীতিবিদ-মন্ত্রী-সাংসদ-বিধায়ক এবং আমলা-পুলিশ অফিসাররা তাদের দুর্বৃত্তপণা চালিয়ে যায়। জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে দমনে, জনগণের যে কোন প্রতিবাদকে দমনে এরাই ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে হামলা চালায়। দুর্নীতি, অর্থ তছরূপ ও স্বৈরাচার হাত ধরাধরি করে চলে। নয়া অর্থনীতির জমানায় ওপর থেকে নীচু পর্যন্ত এই দুর্নীতি ও স্বৈরাচারের সহাবস্থান ও যোগসাজশ আমরা প্রতিদিন অনুভব করে চলেছি। টু-জি স্ক্যাম, কয়লা দুর্নীতি থেকে সারদা কেলেঙ্কারি এক সূত্রে বাঁধা এবং একই অর্থনৈতিক নীতির উপজাত ফসল।

পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান, বাড়বাড়ন্ত ও দৌরাত্মের পিছনে এই অপরাধী অর্থলগ্নি চিটফাণ্ডগুলোর মুখ্য ভূমিকা ছিল এবং আছে। বামফ্রন্ট সরকার বিরোধী যে গণক্ষোভ ২০০৬ পরবর্তী সময়ে গড়ে উঠেছিল এবং ২০১১-র সরকার পরিবর্তন পর্যন্ত এগিয়েছিল, তৃণমূল কংগ্রেস তার ফায়দা তুলেছে। মমতা ব্যানার্জী ও তার দলবলকে অর্থ দিয়ে, প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে লাগাতায় সহযোগিতা করে গেছে। যে সমস্ত সংগঠন তৃণমূল নেত্রীর এই 'লড়াকু' ভূমিকায় অভিভূত হয়ে তাঁর সঙ্গে ভিড়েছিলেন, তারা এই সমস্ত চিটফাণ্ডগুলোর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। আজ যখন 'সততার প্রতীক' (এই চিটফাণ্ডওয়ালারাই এই শ্লোগান জুগিয়েছিল) আদ্যন্ত '*সারদার প্রতীকে*' চিহ্নিত হয়ে গেছেন, তখন দুর্নীতি বিরোধী লড়াই নিছক আমানতকারীদের অর্থ ফেরতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। যে অপরাধী রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, সাংসদ, পুলিশ আধিকারিক, আমলা লক্ষ লক্ষ আমানতকারীরা *অর্থ তছরূপে যুক্ত যার নেতৃত্ব দিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী স্বয়ং* তাদের বিরুদ্ধে *তদন্তের* বর্শামুখকে পরিচালিত করার ন্যায়সঙ্গত দাবি উঠেছে। এদেরই অপরাধে সারদার চিটফাণ্ড ব্যবসা '*বিন্দু থেকে সিন্ধু*'তে পরিণত হয়েছে আর *শতাধিক এজেন্টের আত্মহত্যার* কারণ হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে *ফৌজদারি মামলা* অবিলম্বে শুরু করতে হবে। তাই পশ্চিমবাংলায় এ মুহূর্তে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম এবং দুর্নীতি বিরোধী সংগ্রাম একসূত্রে বাঁধা। এই অপরাধী তৃণমূল জমানার বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও জোরদার করা সময়ের দাবি। পশ্চিমবাংলার বামপন্থী-গণতান্ত্রিক মানুষ এই দাবিতেই পথে নেমেছেন।

রাজ্য রাজনীতি যখন এই সারদা-দুর্নীতি বিরোধী লড়াইয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছে তখন আসরে অবতীর্ণ হয়েছে অন্য দুই চরম দুর্নীতিগ্রস্ত অগণতান্ত্রিক দল—বিজেপি এবং কংগ্রেস। যে বিজেপির কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা কয়লা কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত হয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল (লোকায়ুক্ত তার তথ্য-প্রমাণ জনসমক্ষে হাজির করেছিল) তার মুখে দুর্নীতি-বিরোধী কথাবার্তা হাস্যকর। বিজেপিও সেটা জানে। তাই দুর্নীতি-বিরোধী গণতান্ত্রিক লড়াইকে *সাম্প্রদায়িক রঙে* রাঙিয়ে দেওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা চলেছে। সুযোগও পেয়ে গেছে। তৃণমূলী রাজ্যসভা সাংসদ আহমেদ হাসান-জামাত যোগাযোগের সংবাদকে বিজেপির বর্তমান মুখপত্র এক প্রভাতী দৈনিক ফলাও করে ছাপাচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর, পররাষ্ট্র দপ্তর এই 'তথ্য' উন্মোচনে উঠেপড়ে লেগেছে। আহমেদ হাসান রাষ্ট্রদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, এর জন্যই ভারত-বাংলাদেশ তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি হতে পারেনি, হাসান নিষিদ্ধ মুসলিম সংগঠন সিমি-র সঙ্গে যুক্ত ইত্যাদি সংবাদ ফলাও করে প্রচার করছে। দুর্নীতি বিরোধী লড়াইকে মুসলিম বিরোধী লড়াইয়ে রূপান্তরিত করার এই অপচেষ্টা সম্পর্কে রাজ্যবাসীকে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা দুর্নীতি বিরোধী এই লড়াইয়ের বর্শামুখ যখন খুবই নির্দিষ্ট—স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ও তাঁর অন্যতম সহযোগী দলের তথাকথিত সর্বভারতীয় সম্পাদক যখন তদন্তের মুখোমুখি হতে বাধ্য, তখন আসিফ খান, আহমেদ হাসানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গতিমুখ বদলে দেওয়ার যে অপচেষ্টা বিজেপি চালাচ্ছে, তার পেছনে কোন কোন কারণ আছে, তার দিকেও আমাদের নজর রাখতে হবে। সি বি আই, এফ ডি আই, মমতা ব্যানার্জী 'ডিল' হচ্ছে কিনা—বিজেপির এই অভিসন্ধি থাকতেই পারে।

অন্যদিকে চরম দুর্নীতিগ্রস্ত দল কংগ্রেস হঠাৎ সারদা নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছে। যে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এবং স্বয়ং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরাসরি আঙুল উঠেছে, সর্বশেষ 'ক্যাগ' রিপোর্টে টু-জি কেলেঙ্কারি নিয়ে যে সব তথ্য সামনে আসছে, তখন কংগ্রেস দল দুর্নীতি-বিরোধী লড়াইয়ে কতটা মিত্র হতে পারে, রাজ্যবাসী সে সম্পর্কে স্পষ্ট। দুর্নীতি-বিরোধী লড়াইয়ে বহুবিধ উদ্যোগ শুরু হয়েছে, ভবিষ্যতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আরও বহু সংগঠন/ফোরাম পথে নামবে। দুর্নীতি-বিরোধী লড়াইয়ের একনিষ্ঠ সৈনিক হিসাবে আমাদের স্বাধীন উদ্যোগের পাশাপাশি এই ধরণের অপার্টি বা অরাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গেও আমাদের যুক্ত উদ্যোগের সম্ভাবনা বাড়ছে। পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী তাতে আমাদের সাড়াও দিতে হবে।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, যে নাগরিক সমাজ ও বুদ্ধিজীবীকুল দুর্নীতির বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের জন্য সাড়া জাগিয়ে পথে নেমেছিলেন, তারা আজ নিশ্চুপ কেন? বাংলার বামপন্থী-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিটি বাঁকে এঁদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল—তেভাগার দিনগুলো থেকে নকশালবাড়ি—জনগণের আন্দোলনের সপক্ষে এরা পথে নেমেছিলেন, সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন। আজ আবার এঁদের পথে নামার পরিপ্রেক্ষিত তৈরি হয়েছে। যাঁরা বিভ্রান্ত, কিছুটা বিপথগামী বা ধন্ধে রয়েছেন, তাঁদের কাছে আমাদের যেতে হবে। অন্যথায় একটি ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফায়দা তুলতে বিজেপি ও কংগ্রেসের মত দক্ষিণপন্থী দলগুলো উঠেপড়ে লাগবে।

রাজ্যজুড়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে তুমুল আলোড়ন উঠেছে, অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে জনগণ যখন পথে নেমেছেন, তখন বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলনই একমাত্র বিকল্প। স্বৈরাচারী-দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করাই আজ সময়ের দাবি। **- পার্থ ঘোষ**

সারদা কেলেংকারিতে তৃণমূল-বিরোধী ধিক্কার দিবস

সারদা প্রতারণার কেলেংকারিতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের জড়িত নেতা-মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার ও মুখ্যমন্ত্রীর জবাবদিহির দাবিতে ১৪ সেপ্টেম্বর সি পি আই (এম এল)-এর ধিক্কার দিবস পালন করার আহ্বান ছিল।

হাওড়া জেলার বালী ঘোষপাড়া বাজারে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন কমরেড কার্তিক পান্ডে, দীপক চক্রবর্তী, রঘুপতি গাঙ্গুলী ও নীলাশিষ। সভা চলাকালীন পাঁচটি সংগঠন মিলে গঠন হওয়া গণমঞ্চের ২২ সেপ্টেম্বরের বিক্ষোভ মিছিলকে সফল করে তোলার প্রচারপত্র বিলি করা হয়। অঞ্চলের মানুষজন যথেষ্ট কৌতূহল নিয়ে প্রচারসভার বক্তব্য শোনেন। মধ্য হাওড়ায় ধিক্কার দিবসটি পালিত হয় অবশ্য ৭০ দশকের তিন শহীদ কমরেড তপন ঘোষ, অনুপ চন্দ ও করুণাময় সরকারের স্মরণে আয়েজিত কর্মসূচীর সাথে মিলিয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর। অনুষ্ঠিত পথসভায় বক্তা ছিলেন জেলা কমিটি সদস্য প্রভাত কুমার, ভোলানাথ চৌধুরী ও জেলা সম্পাদক দেবব্রত ভক্ত। গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন সংযোগ সাংস্কৃতিক সংস্থা। ধিক্কার দিবসে এছাড়া পথসভা হয় আরুপাড়ায় রেলগেট বাজারে। ঐ সভায় বক্তা ছিলেন জেলা কমিটি সদস্য প্রণব মন্ডল প্রমুখ।

হুগলি জেলায় কোন্নগর ও সাটিথানে প্রতিবাদী মিছিল বের হয়। কোন্নগরে পার্টির আঞ্চলিক কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হওয়া মিছিল কোন্নগর-হিন্দমোটর অঞ্চল পরিক্রমা করে। মিছিলে লোকাল কমিটি সদস্য বাবু দে, দীপঙ্কর সেনগুপ্ত, প্রদীপ সরকারের নেতৃত্বে ছিলেন ছাত্র ও নির্মাণ শ্রমিকরা। অপরদিকে পোলবা-দাদপুর ব্লকের সাটিথান গ্রাম পঞ্চায়েতে পার্টির পক্ষ থেকে কর্মসূচী পালিত হয়। ধড়িষা গ্রাম থেকে মিছিল শুরু হয়ে দিগনেশ্বর মোড় হয়ে ডুমুরপুরে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটি সদস্য সজল অধিকারি সহ শুভাশীষ চ্যাটার্জী, অসিত দাস ও হরিহর চক্রবর্তী। সাটিথান পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান নিজের পেটোয়া লোক ছাড়া আর কারো সাথে সাক্ষাৎ করেন না, এমনকি সাধারণ মানুষ পঞ্চায়েতে ঢুকতে গেলে বাধা দেওয়া হয়। এই জনবিরোধী আচরণের বিরুদ্ধেও সাধারণ মানুষকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর পাণ্ডুয়া ব্লকের ইলছোবা অঞ্চলে ৫০ জনের মিছিল সংগঠিত হয়, শেষে স্থানীয় বকুলতলা বাজারে সভা হয়। বক্তা ছিলেন নিরঞ্জন বাগ, সাধন মাল প্রমুখ।

উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়া বাজার বাসস্ট্যান্ডে ধিক্কার সভা করা হয়। সুসজ্জিত পথসভায় সারদা কেলেংকারির সাথে তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের সংযোগ উল্লেখ করে অপরাধীদের শাস্তির দাবি জানান সি পি আই (এম এল) রাজ্য কমিটির সদস্য কৃষ্ণ প্রামাণিক। তিনি অন্যদিকে এলাকায় বিজেপির সাম্প্রদায়িক প্রচার চালানোর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনও করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন লোকাল কমিটির সম্পাদক কার্তিক দে। সবশেষে বলেন, বর্ষিয়ান কমরেড কেশবলাল বিশ্বাস। সভার দিনটি ছিল হাটবারে, তাই বহু মানুষ বক্তব্য শোনেন। অশোকনগরে ১৪ সেপ্টেম্বর মিছিল হয়, নৈহাটিতে গৌরীপুর জুটমিল সংলগ্ন ৫টি ওয়ার্ডের শ্রমজীবীদের মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

নদীয়ার ধুবুলিয়া, নাকাশিপাড়া এবং নবদ্বীপে বিক্ষোভ মিছিল, সভা কর্মসূচী পালন করা হয়। নাকাশিপাড়ায় আইনমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করা হয়।

সারদার দুর্নীতিতে যুক্ত নেতা ও মন্ত্রীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ১১ সেপ্টেম্বর বর্ধমানের কালনার অকালপৌষ অঞ্চলে বিক্ষোভ মিছিল এবং ১৪ সেপ্টেম্বর বৈদ্যপুর বাসস্ট্যাণ্ডে বিক্ষোভ সভা সংগঠিত হয়। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও রাজ্য কমিটি সদস্য অশোক চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

১৪ সেপ্টেম্বর রাজ্যব্যাপী সারদা কেলেঙ্কারির দায়ে অভিযুক্ত তৃণমূল সরকারের মন্ত্রী, আমলা, সাংসদ সহ সমস্ত অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে এবং প্রতারিত সাধারণ মানুষের টাকা অবিলম্বে ফেরত দেওয়ার দাবিতে বেহালা অঞ্চলে প্রচার ও ট্যাবলো বার করা হয়। জেমস লঙ সরণীর মোড়ে বক্তব্য রাখার পর ট্যাবলো মদনমোহন তলা, মুচিপাড়া, সিরিটি কালিতলা অঞ্চলে প্রচার ও পথসভা করার মধ্য দিয়ে এই প্রচার কর্মসূচী সমাপ্ত হয়। এই প্রচারে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর কলেজ স্কোয়ার থেকে গণমঞ্চের মিছিলে জনগণকে সামিল হওয়ার আহ্বানও রাখা হয়।

আটের পাতায় দেখুন

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আইসার আবারও বিপুল জয়

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের নির্বাচনেও ভালো ভোট পেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় শক্তি হিসাবে উত্থান

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের (জে এন ইউ এস ইউ) নির্বাচনে এবারও আইসা বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে, কার্যনির্বাহি ৪টি পদই তারা ধরে রেখেছে। প্রেসিডেন্ট পদে আইসার আশুতোষ ১৩৮৬ ভোট পেয়ে বাম ও প্রগতিশীল ফ্রন্টের (এল পি এফ) প্রার্থীকে ৩৭৭ ভোটে পরাজিত করেছেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে আইসার অনন্ত প্রকাশ নারায়ণ পেয়েছেন ১৩৬৬ ভোট, পরাজিত এবিভিপি প্রার্থীর সঙ্গে তাঁর ভোটের ব্যবধান ৬১০। সাধারণ সম্পাদক পদে আইসার চিন্টু কুমারীর পক্ষে পড়েছে ১৬০৫ ভোট, এবিভিপি প্রার্থীকে তিনি পরাজিত করেছেন ৮১৪ ভোটে। যুগ্ম সম্পাদকের পদে আইসার সাফকত হুসেন বাট ১২০৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, এল পি এফ প্রার্থীর সঙ্গে তাঁর প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান ২৪০।

জে এন ইউ এস ইউ-র নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আশুতোষ বলেছেন, ''বিজেপি, আর এস এস এবং এবিভিপি যখন আমাদের বোঝাতে চাইছে যে 'সুদিন' এসে গেছে, তখন জে এন ইউ এস ইউ-র নির্বাচনে আইসার পক্ষে এই বিপুল ও সুস্পষ্ট রায় দেখিয়ে দিল যে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ওদের ফ্যাসিবাদী ও কর্পোরেট এজেণ্ডাকে সন্দেহাতীতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। জে এন ইউ এস ইউ-র এই রায় যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে রায়। এটা সেই জে এন ইউ এস ইউ-র পক্ষেও রায় যা ছাত্রদের পড়াশোনা ও পরিকাঠামোর প্রয়োজনের জন্য লড়াই করে, উচ্চশিক্ষাকে কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে, ক্যাম্পাসে কর্মচারীদের অধিকারের জন্য লড়াই করে এবং কর্পোরেটের জমি গ্রাস, নারীদের বিরুদ্ধে চালিত হিংসা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো, আফস্পা এবং রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে হাত মেলায়।''

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের (ডি ইউ এস ইউ) নির্বাচনে আইসা গতবারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ভোট পেয়েছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিতে সাধারণভাবে এন এস ইউ আই এবং এবিভিপি-র প্রাধান্য ছিল, কিন্তু আইসা সেখানে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়ে এবিভিপি-র সাম্প্রদায়িক এজেণ্ডা এবং এন এস ইউ আই-এবিভিপি-র কর্পোরেটপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ রূপে দেখা দিয়েছে। প্রতিটি পদেই আইসা আগের বারের তুলনায় তার ভোটের যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। তার পক্ষে সর্বোচ্চ ভোট পড়েছে ১২৯৩২ (সম্পাদকের পদে) এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট, সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক পদে এন এস ইউ আই-এর সঙ্গে তার প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান থেকেছে ২১০০ থেকে ২৬০০-র মধ্যে। এই প্রথমবার কোন বাম ছাত্র সংগঠন, বা বলা যায় দিল্লীর শাসক দলগুলোর অর্থ ও পেশিশক্তির রাজনৈতিক মদতপুষ্ট নয় এমন কোন ছাত্র সংগঠন ডি ইউ এস ইউ-র নির্বাচনে এত ব্যাপক সমর্থন ও ভোট পেল। ডি ইউ এস ইউ-র নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি, কেননা সারা দিল্লীতেই ছড়িয়ে রয়েছে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ৪৫টি কলেজ ও এবিভিপি এবং এন এস ইউ আই প্রকাশ্যেই নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করে এবং দুর্নীতির আশ্রয়ও নেয়।

আইসা স্নাতক স্তরে ৩ বছরের পাঠক্রমকে ৪ বছর করার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচার চালিয়েছে, ছাত্রদের যাতায়াতের সুবিধা ও সাধ্যায়ত্ত ভাড়ার জন্য লড়াই করেছে, দিল্লীতে ধর্ষণ ও দুর্নীতি বিরোধী লড়াইয়ে ভূমিকা রেখেছে এবং এবারে তার সাফল্য এই সমস্ত আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি।

দিল্লীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আইসার আত্মঘোষণা সারা দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোর কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ ও সহায়ক উপাদান।

সারদা হতে পারে তৃণমূল সুপ্রীমোর ওয়াটারলু

হুইসেলব্লোয়ার শব্দটাকে সাম্প্রতিক অতীতে বিশেষ জনপ্রিয় করে তুলেছেন জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ বা এডওয়ার্ড স্নোডেনের মতো মানুষেরা। উইকিলিকসের ওয়েব সাইটে অ্যাসাঞ্জ যেভাবে মার্কিন ও বিশ্বের তাবড় কূটনীতিকদের গোপন কার্যকলাপকে ফাঁস করে দিয়েছেন বা ব্রিটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকা যেভাবে স্নোডেনের থেকে পাওয়া তথ্যসূত্র নিয়ে বিশ্বের তথ্যভাণ্ডারের ওপর মার্কিন ও তার সহযোগীদের নজরদারির ঘটনাবলী জনসমক্ষে এনে দিয়েছে, তা ক্ষমতার দুনিয়ার অনেক সমীকরণকেই পাল্টে দেওয়ার বিস্ফোরক সমৃদ্ধ। আমাদের রাজ্যের শাসক দলের বিভিন্ন দুর্নীতি ও কার্যকলাপ সারদা তদন্তের সূত্রে যেভাবে উঠে আসছে তা দুর্নীতির পর্দা ফাঁস করে দেওয়ার চমকপ্রদ এসব নিদর্শনগুলোকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে। সারদা তদন্ত আজকে আর আর্থিক দুর্নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তা দেশের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার থেকে রাজ্যের ক্ষমতা বদল, পেইড মিডিয়ার চরম নিদর্শন থেকে মিডিয়া ও রাষ্ট্রশক্তির সংযোগ, সাম্প্রদায়িক মৌলবাদকে ব্যবহার করে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করার মত মারাত্মক প্রবণতা থেকে বুর্জোয়া রাজনীতির সঙ্গে আর্থিক কেলেঙ্কারির নিবিড় সম্পর্কের মতো অনেক বিষয়কেই সামনে নিয়ে আসছে।

সারদার আর্থিক কেলেঙ্কারির পরিমাণ ঠিক কত, তা এখনও নির্ভুলভাবে বলা সম্ভব নয়। হিসাব নিকাশ ও এখনও অবধি পাওয়া তথ্য প্রমাণ থেকে তা দশ হাজার কোটি টাকার মতো বলে অনেকে অনুমান করছেন। এই বিপুল পরিমাণ টাকা পঞ্জি স্কিমের লোক ঠকানোর ব্যবসা করে সারদা তুলতে পেরেছিল কীভাবে? কীভাবে তারা মানুষকে বিশ্বাস করাতে পেরেছিল অবিশ্বাস্য সুদসহ আসল ফেরতের কাল্পনিক গল্পগাথা? তদন্তের থেকে বোঝা যাচ্ছে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিত্বকে একাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। একদিকে তাদের সঙ্গে সারদা কর্তা বা সংস্থার যোগাযোগের ছবি ও খবরকে নিপুণভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, অন্যদিকে দুর্নীতি সংক্রান্ত আইনি সমস্যার মোকাবিলায় এইসব ক্ষমতাশালীদের রাখা হয়েছিল ঢাল হিসাবে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আসাম, ত্রিপুরা, উড়িষ্যার মত প্রতিবেশী রাজ্যে সারদা দুর্নীতির জাল ছড়ানো এটা আগেই জানা গিয়েছিল। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে তার প্রভাব দেশের সীমাকেও ছাড়িয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে সারদা দুর্নীতির পরিমাণ নিঃসন্দেহে সর্বাধিক এবং তার নেটওয়ার্কও পশ্চিমবঙ্গের সব প্রান্তের গ্রাম-শহরকে যেভাবে ছেয়ে ফেলছিল, তা বিস্ময়কর। কেন্দ্রের যে সমস্ত আর্থিক বেনিয়ম সম্পর্কে লক্ষ্য রাখার সংস্থাগুলো আছে, তারা কেন পঞ্জি স্কীমের এই ব্যাপক বিস্তারকে আটকাতে সচেষ্ট হয়নি, সে সম্পর্কে এখনও খুব বেশি কিছু জানা যায়নি। নিঃসন্দেহে সে রহস্য উন্মোচন করতে হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সারদা দুর্নীতিকে রুখতে, মানুষকে সচেতন করতে একসময় ক্ষমতায় আসতে চলা, অতপর ক্ষমতায় চলে আসা তৃণমূল কংগ্রেস কেন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি, তা এতদিনে সবাই জেনে গেছেন। তৃণমূল দল ও তার সরকারের প্রতি নিষ্ক্রিয় থাকার কোনও 'আপাত পেলব' অভিযোগ অবশ্য সঙ্গত কারণেই কেউ করছেন না, কারণ বিষয়টা চোখ বন্ধ করে থাকার নয়, ঢাকঢোল পিটিয়ে সরবে ডাকাতিতে নেমে পড়ার। গ্রেপ্তার হওয়া তৃণমূল সাংসদ কুনাল ঘোষ আদালতের বাইরে সংবাদ মাধ্যমকে যেন কোনও তথ্য বা অভিযোগ না জানাতে পারেন তার জন্য সরকারের নির্দেশে পুলিশ সরবে 'হা রে রে রে' শব্দ করে চলেছে। ডাকাতির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই রব সরকারের রক্ষক বাহিনীর মুখে প্রকাশ্যে উঠে আসা প্রতীকী তাৎপর্য বহন করে বই কি। তৃণমূলী নেতা-নেত্রীরা কীভাবে সারদার অর্থ ডাকাতির সঙ্গে জড়িত তার সমুদয় আখ্যান মূল মহাভারত না হোক, অন্তত রাজশেখর বসু কৃত তার সারানুবাদের আয়তন নেবে।

আমরা সেই আদ্যপান্ত বিবরণে এখানে যেতে চাই না, যাওয়ার প্রয়োজনও নেই। বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে প্রচুর প্রতিবেদন প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হচ্ছে। একটি দুটি নিদর্শনকে সামনে রেখে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে। যেমন সারদাকে জঙ্গল মহলের স্বাস্থ্য পরিষেবায় যুক্ত করার বিষয়টি। সারদার মাধ্যমে জঙ্গল মহলে স্বাস্থ্য পরিষেবার সূচনা করলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কিছুদিন প্রকল্প চালিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবাটি বন্ধ করে দেওয়া হল। এরপর মুখ্যমন্ত্রী-সংযোগের ছবিকে ব্যবহার করা হল টাকা তোলার কাজে। স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য কেনা বাইকগুলো ব্যবহৃত হল এজেন্টদের টাকা তোলার কাজে আর স্বাস্থ্যকর্মীরা ছাঁটাই হয়ে গেলেন। ছদ্ম সরকারি হয়ে ওঠা সারদা বিপুল টাকা তুলতে পারল সরকারি প্রকল্প ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তার সংযোগকে ব্যবহার করে।

নেতা-মন্ত্রী ও সরকারের সঙ্গে সংযোগের দিকটিকে ব্যবহার করার আরেকটি দৃষ্টান্ত রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদে আই আর সি টি সি-র সঙ্গে সারদার সংযোগ, যার অনুপুঙ্খ দিকগুলো এখন তদন্তের আওতাধীন। সারদা যেমন সরকার ও নেতা-মন্ত্রীদের টাকা তোলার কাজে ব্যবহার করে নিয়েছে, তেমনি নেতা-মন্ত্রীরা এর ফি বাবদ সারদার থেকে টাকা নিয়ে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করেছেন। তৃণমূলের কত নেতা-মন্ত্রী-সাংসদ সারদার থেকে কাজের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে বিপুল 'মাইনে' পেয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। আর শীর্ষস্তরে ছবি কেনা-বেচায়। বন্ধ খামে কত কোটির লেনদেন হয়েছে তার ছবি এখনও সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়নি।

উন্মোচিত হয়নি ডেলো পাহাড়ের বৈঠকে ঠিক কি চুক্তি হয়েছিল সারদা কর্তা ও তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে। সারদার সংবাদ মাধ্যমগুলোকে কীভাবে পেইড নিউজ প্রচারে নিয়োজিত রাখা হয়েছিল, তা এখন দিনের আলোর মত স্পষ্ট। প্রজেক্ট প্রধানমন্ত্রী ২০১৪-তে মমতা সারদার চুক্তির পূর্ণাঙ্গ ছবিটির দিকে সবার নজর থাকবে।

পঞ্জি স্কিমের লোক ঠকানো টাকায় প্রজেক্ট মুখ্যমন্ত্রী বা প্রজেক্ট প্রধানমন্ত্রীর মত অনেক প্রকল্পই চলেছে। তাদের কয়েকটি এমনকি দেশের সীমাও ছাড়িয়েছে। তৃণমূল মনোনীত রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রাক্তন সিমি নেতা ইমরান সম্পর্কে অভিযোগ তিনি শাহবাগ আন্দোলনকে ভাঙার জন্য বাংলাদেশে নিষিদ্ধ জামাতকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ পাঠিয়েছেন। শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য তিস্তা চুক্তি বাতিল করতে মুখ্যমন্ত্রীকে প্ররোচিত করেছেন এবং হাসিনার বিরুদ্ধে চুক্তি বাতিলের ফলে অনুমিত জনরোষ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। এ বিষয়টি নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশের সরকারই আলাদা আলাদাভাবে তদন্ত করার কথা বলেছেন।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের বাইরেও বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলকে সারদা টাকা দিয়ে কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেছে বা নিজের কাজে লাগিয়ে নিয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার থেকে দুঁদে আইনজীবী—তালিকাটা বেশ লম্বা। সারদা তদন্ত বাস্তবিক পক্ষেই আর শুধু কোনো আর্থিক দুর্নীতির ঘটনা হিসেবে সীমায়িত নেই। তা রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক, কূটনৈতিক—সমস্ত বিষয়কেই গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

সারদা তদন্তের বর্তমান পর্যায়ে এটাও স্পষ্ট হয়েছে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন তদন্ত মোটেই নিরপেক্ষ ছিল না এবং তা সারদা কেলেঙ্কারির সুবিধা ভোগীদের আড়াল করতে চেয়েছে এবং সেইসূত্রে এমনকি তারা ব্যাপক পরিমাণ তথ্যপ্রমাণ লোপের চেষ্টা করেছে বলেও অনেকে মনে করেছেন। সি বি আই-এর হাতে যাওয়ার পর তদন্তের অগ্রগতি হলেও গণআন্দোলনের লাগাতার চাপ বজায় রেখে সারদা কাণ্ডের সমস্ত কালো দিককে উন্মোচিত করতে হবে। সমস্ত দোষীর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, তা তিনি যত ক্ষমতাশালী বা উচ্চপদাধিকারীই হোন না কেন। ইতিমধ্যেই দল মত নির্বিশেষে মানুষ পথে নেমেছে, ১১ সেপ্টেম্বর সারদা কাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের এক জনাকীর্ণ বিক্ষোভ মিছিলে পা মিলিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। শিক্ষাবিদ সুনন্দ সান্যাল, অসীম চ্যাটার্জীদের সঙ্গে ছিলেন সি পি এমের সুজন চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী, রবীন দেব, আর এস পি-র মনোজ ভট্টাচার্য, কংগ্রেসের নির্বেদ রায়, প্রদীপ ভট্টাচার্য, আব্দুল মান্নান, সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের বর্ষীয়ান নেতা কার্তিক পাল, বাসুদেব বসু, অতনু চক্রবর্তী, নবেন্দু দাশগুপ্তর মত নেতারা। ছিলেন পি ডি এস-এর সমীর পুততুণ্ড, ভারতের সাম্যবাদী দলের বর্ণালী মুখার্জী, শিল্পী সমীর আইচ, নাট্যব্যক্তিত্ব চন্দন সেন প্রমুখরাও। সি পি আই (এম এল)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ ও পথসভার আয়োজন করা হয়েছে। গণমঞ্চর তরফেও মিছিল, সভার আয়োজন করা হয়েছে। দাবি করা হয়েছে দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি। ডেলো পাহাড়ের সেই রহস্যময় বৈঠক থেকে শুরু করে সারদা-তৃণমূল তথা তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের সম্পর্ক নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর খোলাখুলি বক্তব্য জানতে চায় রাজ্যবাসী।

কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে এখনও মুখে কুলুপ এঁটে আছেন এবং সত্যের মুখোমুখি হওয়ার বদলে বেলুড় মঠ থেকে খেলো বিবেকবাণী আউড়াচ্ছেন। মাঠে নামানো হয়েছে তৃণমূলের মহিলা ব্রিগেডকে, তাঁরা সল্টলেকে সি বি আই অফিসের সামনে গান গেয়েছেন, বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্বের কেউ ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার তো কেউ বা গ্রেপ্তার হওয়া নেতাদের আর সতীর্থ বলে চিনতে চাইছেন না। কেউ রহস্যজনকভাবে 'অসুস্থ' হয়ে পড়ছেন, যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা পরীক্ষাতে সে রোগ ধরা পড়ছে না। জনগণ যদিও রোগটা বুঝে ফেলেছেন। আর উপযুক্ত ওষুধ না পড়লে লক্ষ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত শান্ত হবেন না। নেপোলিয়নের প্রতাপও এক ওয়াটারলু যুদ্ধে ধরাশায়ী হয়েছিল। সারদা কেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের 'ওয়াটারলু' হবে কিনা আগামীদিনের গণ আন্দোলনই তা ঠিক করে দেবে।

- সৌভিক ঘোষাল

বিরাট ব্যাঙ্ক ডাকাতি—লুঠের পরিমাণ ২ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা!

কোন সিঁদ কেটে বা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে নয়! সশস্ত্র প্রহরীকে অতর্কিতে আক্রমণ করে ব্যাঙ্কের সিন্দুক থেকে বলপূর্বক টাকা লুঠ করার ঘটনাও নয়! উল্লিখিত সংখ্যাটি লুঠ হয়েছে আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে। লুঠ হচ্ছে প্রতি পলে। প্রতিদিনে! দিন-দুপুরে। নীরবে। বছরের পর বছর ধরে! ব্যাঙ্কগুলোকে জাহান্নামে পাঠাতে গৃহীত ব্যাঙ্কিং নীতির পথ ধরে অবাধে চলছে এই লুণ্ঠন। হচ্ছে বিরাট ব্যাঙ্ক ডাকাতি। লুঠেরার নাম—বৃহৎ, একচেটিয়া কর্পোরেট ঘরানা! পরিণাম—রীতিমত বিপর্যস্ত ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের আর্থিক বা বিত্তীয় বুনিয়াদ!

আপনি কি জানেন যে, গত এপ্রিল ১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩, এই ৯ মাস পর্যন্ত আমার-আপনার-আম জনতার যে কষ্টার্জিত টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রয়েছে, **তার প্রতি এক টাকার মধ্যে ১৩ পয়সা আর ফেরত পাওয়া যাবে না। ব্যাঙ্কের পরিভাষায় তা পরিণত হয়েছে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট বা অনুৎপাদক বা অনাদায়ি ঋণে! আর, ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া এক টাকার মধ্যে ৬০ পয়সাই জলে গেছে!** (ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ১৩ মার্চ ২০১৪)।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের হাল-হকিকত

ভারতীয় ব্যাঙ্কের আজ এমনই হাল! ৮০ ট্রিলিয়ন (৮০ লক্ষ কোটি) টাকা-র আর্থিক ভিত্তি বা বনিয়াদের ওপর টিকে থাকা ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা এতই সংকটে পড়েছে যে, **বর্তমানে বিপুল পরিমাণে অনাদায়ি ঋণের অর্ধেক পরিমাণও পুনরুদ্ধার করা যাবে না**—এমনই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। আর, চরম বিপদ সংকেতের বাঁশী বেজে উঠল তখনই, যখন দেখা গেল যে **ভারতবর্ষের বৃহত্তর ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্কের গ্রস বা মোট এন পি এ পরিমাণ ৬৭,৭৯৯ কোটি টাকার অঙ্কে ছুঁয়েছে**, অর্থাৎ তা অতিক্রম করেছে ৫ শতাংশের সীমা! এছাড়াও, যে বিপদের লক্ষণগুলো সামনে এলো তা পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরা হচ্ছে—

● এপ্রিল '১৩ থেকে ডিসেম্বর '১৩ পর্যন্ত ৪০টি নথিভুক্ত ব্যাঙ্কের মোট এন পি এ তার পূর্বেকার ২.৪ লক্ষ কোটি টাকার সীমা মারাত্মক হারে অতিক্রম করে ৩৫.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬৩,৩৮৬ কোটি টাকা! ২০১৩-১৪-র আর্থিক বছরের প্রথম ৬ মাসে ঐ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২৭ শতাংশ!

● চল্লিশটি নথিভুক্ত ব্যাঙ্কের মোট এন পি এ ২.৪৩ লক্ষ কোটি টাকা, যা প্রায় ৭০ শতাংশ! **এর মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্কের মোট বা গ্রস এন পি এ সর্বোচ্চ ৬৭,৭৯৯ কোটি টাকা যা সমগ্রের ২৮ শতাংশ**! এর পরেই রয়েছে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পি এন বি), যার এন পি এ-র পরিমাণ ১৬,৫৯৬ কোটি টাকা এবং সমগ্রের ৭ শতাংশ। তারপর তালিকায় নাম উঠে আসছে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, যাদের প্রত্যেকের এন পি এ সমগ্রের মধ্যে ৫ শতাংশ হারে পড়ছে।

● একটা যেন অলিখিত প্রতিযোগিতা চলছে। কোন ব্যাঙ্কের এন পি এ সবচেয়ে বেশি, তারই প্রতিযোগিতা। তাই দেখা গেল, ডিসেম্বর ৩১, ২০১৩ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের এন পি এ এই পর্যায়ে সবচেয়ে বেড়ে ২০৯ শতাংশ হয়েছে, যার পরিমাণ দাঁড়াল ৩৫১৬ কোটি টাকা। ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তা ছিল ১১৩৮ কোটি টাকা!

২০১৩-১৪-র আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের এন পি এ একলাফে বেড়ে ৮৫৪৬ কোটি টাকা হয়েছে, বৃদ্ধির পরিমাণ মোট এন পি এ-র ১৮৮ শতাংশ! এপ্রিল '১৩ থেকে ডিসেম্বর '১৩ পর্যন্ত এগারোটি ব্যাঙ্কের এন পি এ বেড়েছে ৫০ শতাংশ হারে!

● লাগামহীন এন পি এ খাতের বৃদ্ধিতে রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আর্থিক সমীক্ষা, ২০১৪। **এই সমীক্ষা দেখিয়েছে যে মার্চ ২০১০ থেকে মার্চ ২০১৪—এই চার বছর এন পি এ বৃদ্ধির পরিমাণ চারগুণ!**

● ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি রেশিও (সি এ আর) হল ব্যাঙ্কিং পরিভাষায় একটা মাপকাঠি, যা থেকে বোঝা যায় যে ব্যাঙ্কের সঞ্চিত পুঁজি কতটা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এই অনুপাত যত হ্রাসপ্রাপ্ত হবে, ততই ঝুঁকিপূর্ণ হবে ব্যাঙ্কের আমানত। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এন পি এ-র জন্য ভারতীয় ব্যাঙ্কের পুঁজি বা আমানত গত ৬ বছরের তুলনায় সর্বাপেক্ষা নীচে নেমেছে। মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত উল্লিখিত সি এ আর ছিল ১১.১৮, আর জুন ২০১৪-র মধ্যে তা আরও কমে হয়েছে ১০.৬৭।

● ২০১৪-১৫-র আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে অর্থাৎ জুন পর্যন্ত ২৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত এবং ১৫টি বেসরকারি ব্যাঙ্কের ওপর সমীক্ষা চালায় মুডির সমীক্ষক ইকরা (আই সি আর এ)। তাদের সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরের মোট ৩.৯ শতাংশ এন পি এ ২০১৪-১৫-তে আরও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ৪-৪.২ শতাংশ হারে। আর এ বছরের মার্চ পর্যন্ত ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলোর মোট এন পি এ ২.৫০ লক্ষ কোটি টাকা—**যা উত্তরপ্রদেশের বার্ষিক বাজেটের সমান পরিমাণ।**

কে দায়ী? কারা দায়ী?

কিন্তু ব্যাঙ্কগুলোর এমন শোচনীয় পরিস্থিতি হল কীভাবে? ভারতবর্ষে নেমে আসা অর্থনৈতিক মন্থরতা, আর্থিক সংকটের ফলে কর্পোরেট ঘরানাগুলো নাকি তাদের বকেয়া ঋণ শোধ করতে পারেনি, এমন বাহানা হামেশাই শোনা যায়। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর তরফ থেকে চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন পরিচালন পদ্ধতি, ভুল নীতি প্রণয়ন এমনকি উচ্চস্তরে দুর্নীতির মিলিত বিষফল এই অনাদায়ি ঋণ। ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ আর্থিক বৃদ্ধির পর্যায় ২০০৩-০৪ এবং ২০০৭-০৮-এর মধ্যে বেশ কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক অকাতরে যথেচ্ছভাবে ঋণ বিতরণ করেছিল। **ক্রেডিট স্যুইসে ইণ্ডিয়া রিপোর্টে জানিয়েছে যে, ১০টি বৃহৎ কর্পোরেট ঘরানা সর্বাপেক্ষা বেশী ঋণ নিয়েছে। তাদের ঋণ নেওয়ার পরিমাণ এতটাই বেশি যে গত ৬ বছরে তাদের আর্থিক দায় ৬ গুণ বৃদ্ধি পায়।** লেম্যান ব্রাদার্স-এর পতনের মধ্যে দিয়ে দুনিয়া জুড়ে যখন প্রবল অর্থনৈতিক সংকট ঘনিয়ে এল, তখন ভারতীয় নীতিকাররা গদ্‌গদ্ ভঙ্গীতে বলেছিলেন যে ভারতের অর্থনীতিকে নাকি তা ছুঁতেও পারবে না। কিন্তু সংকট থেমে থাকল না। তার থাবা ভারতীয় অর্থনীতিতে পড়তে শুরু করল। আর এরই ফলশ্রুতিতে হু হু করে বাড়তে শুরু করল অনাদায়ি ঋণ বা এন পি এ। বিশেষ করে ২০১২-র পর থেকে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর কাছ থেকে নেওয়া কর্পোরেট ঘরানাগুলোর বিপুল ঋণ আলোচিত হতে শুরু হল, ব্যাঙ্কের আর্থিক বুনিয়াদে যখন বেজে গেল বিপদ সংকেতের ঘন্টা।

উল্লিখিত ১০টি কর্পোরেট ঘরানার মধ্যে ছিল আদানি, এসার, জিভিকে, জায়পি, জে এস ডব্লিউ, ল্যাঙ্কো, রিলায়েন্স এ ডি এ জি এবং বেদান্ত গ্রুপের কোম্পানি। ২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২-র পর্যায়ে এই গ্রুপগুলো দ্বিগুণেরও বেশি ব্যাঙ্ক ঋণ পায়। **আর, ঐ সময়ের মধ্যে তাদের নেওয়া ঋণের পরিমাণ ভারতীয় ব্যাঙ্কের নেটওয়ার্ক বা সম্পদের ৯৮ শতাংশ হয়ে দাঁড়ায়।** ঋণ পরিশোধযোগ্যতা, বা আর্থিক মানদণ্ডগুলো ঐ গ্রুপের বেশ কিছু কোম্পানীর মধ্যে সন্তোষজনক ছিল না। **এমনকি, ওদের মধ্যে কোন কোন গ্রুপ প্রকৃত অর্থে ভারতীয়-ই নয়, যেমন, বেদান্ত। এই গ্রুপটির সদর দপ্তর লণ্ডন।** ভারত, অস্ট্রেলিয়া বা অন্যান্য দেশগুলোতে খনি ও কলকারখানা অধিগ্রহণ করতে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলোর কাছ থেকে বেদান্ত ঋণ নিয়েছে (তথ্যসূত্র ঃ নায়েক কমিটি প্রপোজালস্, অমিয় কুমার বাগচি, ই পি ডব্লিউ, জুন ১৪, ২০১৪)।

ভারতের শাসকশ্রেণী তার নয়া উদারনৈতিক এজেণ্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে ব্যক্তিমালিকানাধীন কর্পোরেট ঘরানাগুলোকে পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত করে। বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, রাস্তাঘাট-বন্দর, অসামরিক বিমান, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি পরিকাঠামো ক্ষেত্রগুলোতে বিপুল পরিমাণ ব্যাঙ্ক ঋণ বিনিয়োগ করা হয়। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে শুধু বিপুল পুঁজি বিনিয়োগই নয়, যথেষ্ট ঝুঁকি থাকে এবং দীর্ঘকালীন সময় জুড়ে তা উশুল করা যায় না। সরকারের চাপেই ব্যাঙ্কগুলো বাধ্য হয়ে পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ করতো। এই পরিমাণ কীভাবে বাড়ে তা একবার দেখা যাক। **মার্চ ১৯৯৮-এর শেষে ঐ খাতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো ২ শতাংশেরও কম বিনিয়োগ করে। কিন্তু মার্চ ২০০৪-এর শেষ পর্যন্ত তা ১৬.৪ শতাংশে বৃদ্ধি পায়, আর মার্চ ২০১২-র শেষে তা বেড়ে ৩১.৫ শতাংশ হয়।** যে চারটি ক্ষেত্রে ঐ বিনিয়োগ মূলত হয়েছিল, তা হচ্ছে, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, বন্দর, টেলিযোগাযোগ এবং অসামরিক বিমান পরিষেবা। পরিকাঠামো খাতে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ঘটেছিল বৃহত্তম ব্যাঙ্কিং ঋণ—মার্চ ২০১১ পর্যন্ত আনুমানিক ২,৬৯,১৯৬ কোটি টাকা! বিপুল ঋণ নিয়ে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে পুনর্গঠিত করার কর্মসূচী ধাক্কার মুখে পড়ে। ভুল বা অপ্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, অদক্ষ পরিচালকবর্গ, বিদ্যুৎ উৎপাদনে অত্যাধিক খরচ প্রভৃতি নানাবিধ কারণে উচ্চাকাঙ্খী বেসরকারি বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো অকার্যকরী হিসাবেই প্রমাণিত হল (সি পি চন্দ্রশেখর, দ্য হিন্দু, ২৯ অক্টোবর, ২০১২)।

কিং ফিশারের উপাখ্যান এবং ভারতীয় ব্যাঙ্কের বদান্যতা

কিছুদিন আগে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর অনাদায়ি ঋণ সংক্রান্ত কয়েকটি রিপোর্ট পাওয়ার পর সি বি আই কিংফিশার এবং আই ডি বি আই-এর বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। অভিযোগ উঠেছে, কিংফিশার বিমান সংস্থার যখন খারাপ সময়, ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা সংক্রান্ত মূল্যায়ন বা রেটিং যখন নেতিবাচক, তখন আই ডি বি আই ঐ সংস্থাকে ৯৫০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিল! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাজার কোটি টাকার ওপর অনাদায়ি ঋণ সংক্রান্ত ৩০টি ঘটনা নিয়ে সি বি আই তদন্ত শুরু করছে।

ঋণ পাওয়ার জন্য কিংফিশার ব্যাঙ্কগুলোর কাছে যে সম্পত্তি বন্ধক রেখেছিল, তার মূল্য আদায় করা ঋণ থেকে অনেক কম। কিংফিশার বিমানের মালিক মাল্য গত বছরে দিয়াজিওর কাছে তাঁর ইউনাইটেড স্পিরিটস্-এর ২৫ শতাংশ বিক্রি করে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিময়ে। কিন্তু ঐ টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধের জন্য তিনি ব্যবহার করেননি। স্টেট ব্যাঙ্ক সহ ১৭টি ব্যাঙ্কের কন্‌সোর্টিয়ামের কাছে কিংফিশারের বকেয়া ৭ হাজার কোটি টাকা, যার মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্কের পাওনা সর্বোচ্চ—১৬০০ কোটি! এই কনসোর্টিয়ামের বাইরে আই ডি বি আই আরও ৯৫০ কোটি টাকা ঋণ কেন দিল, তা রীতিমতো সন্দেহজনক।

২০১০ সালেই কিংফিশার বিমান সংস্থার আর্থিক লক্ষণগুলো খুবই প্রতিকূল হতে থাকে। সেই সময় নভেম্বর ২০১০-এ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে ঐ বিমান সংস্থার ৭,৬৫০ কোটি টাকার অনাদায়ি ঋণকে 'পুনর্গঠিত' (রিস্ট্রাকচার) করে তার একটা অংশকে রূপান্তরিত করে প্রেফারেন্স শেয়ারে। শুধু তাই নয়, ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে দু বছরের মোরাটোরিয়াম, সুদের পরিমাণকে কমানো এবং আরও ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ 'পুনর্গঠনের' পর কিংফিশারের মোট অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬,৩০০ কোটি টাকা! (সূত্র ঃ বিজনেস স্ট্যাণ্ডার্ড, ৩১ জুলাই ২০১৪)

জালিয়াতির খপ্পরে পড়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে উধাও ২৩ হাজার কোটি টাকা

গত তিন বছরের মধ্যে চিটিংবাজি ও ঠকবাজদের পাল্লায় পড়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর আমানত থেকে চুরি হয়েছে ২২,৭৪৩ কোটি টাকা! ৩২০০ কোটি টাকা খুইয়ে ইণ্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক রয়েছে এক নম্বরে, আর তারপর ২,৭১২ কোটি টাকা তহবিল থেকে তছরূপ হয়ে স্টেট ব্যাঙ্ক রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। মজার ব্যাপার হল, ২০১০ এবং ২০১৩-র মধ্যে ইণ্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক নিট লাভ করেছিল ২,৮৪৮ কোটি টাকা। কিন্তু ঐ একই সময়ে লাভের গুড় জালিয়াতিতে চলে যায়। লাভের তুলনায় জালিয়াতিতে উক্ত ব্যাঙ্ক খুইয়েছে ৩,২০০ কোটি টাকা। আর ২০১০-এর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যায়ে স্টেট ব্যাঙ্কের লাভ হয়েছিল ৩৯,৬৯২ কোটি টাকা। আবার, ঐ একই সময়ে জালিয়াতিতে তার তহবিল থেকে চুরি হয়ে যায় ২,৭১২ কোটি টাকা। এছাড়াও, কানাড়া ব্যাঙ্ক, ইউ বি আই, ইউকো ব্যাঙ্ক কয়েক হাজার কোটি টাকা খুইয়েছে জালিয়াতির দৌলতে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, ব্যাঙ্কের শীর্ষ কর্তৃপক্ষ তার ক্ষমতার বাইরে গিয়ে এমন সমস্ত সন্দেহজনক মানুষকে বিপুল পরিমাণ ঋণ দিয়েছে যাদের না রয়েছে বিশ্বাসযোগ্যতা, না আছে ব্যবসা বাণিজ্য করার অতীত রেকর্ড। এমনকি তাদের নথিপত্র পরবর্তীতে জাল হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।

বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর সামনে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে পুনরায় পুঁজির সঞ্চালনা বা রি-ক্যাপিটালাইজেশন। এবারের বাজেট বলেছে যে, ২০১৮-র মধ্যে ব্যাঙ্কগুলোতে ২.৪ লক্ষ কোটি টাকা সঞ্চালনা করা হবে; কিন্তু ২০১৪-১৫-র জন্য ধার্য তহবিলের কোন উল্লেখ নেই। অন্তর্বর্তী বাজেটে, চিদাম্বরম ১১,৩০০ কোটি টাকা ধার্য করেছিলেন। ২০১৩-১৪-র বাজেটে যা ছিল ১৪,০০০ কোটি টাকা। **এবারের বাজেট সরাসরি বলেছে যে সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় হল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোতে সরকারি অংশীদারিত্ব ক্রমশ কমিয়ে আনা।** বাজেটের এই বার্তা পেয়ে দেনা ব্যাঙ্ক সরকারি অংশীদারির ৫৮ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশ কমিয়ে (অর্থাৎ বিলগ্নিকরণ করে) ১,২০০ কোটি টাকা উপার্জন করতে চাইছে, তার বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১৮ শতাংশ ছুঁতে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে নায়েক কমিটির সুপারিশের মধ্য দিয়ে। মোদীর পৌরহিত্যে, অরুণ জেটলির মন্ত্রীত্বে ভারতীয় ব্যাঙ্ক কোন্ পথে যায় তা উত্তর সময়-ই দেবে।

- অতনু চক্রবর্তী

নির্মাণ শ্রমিক ডেপুটেশন

গত ৯ সেপ্টেম্বর চন্দননগর ডেপুটি লেবার কমিশনার অফিসে নির্মাণ শ্রমিক সংগঠনের চুঁচুড়া থানা কমিটির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচী পালিত হয়। ডেপুটি লেবার কমিশনার অনুপস্থিত থাকার কারণে এ এল সি স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। কল্যাণ পর্ষদের টাকা পাওয়া নিয়ে দীর্ঘসূত্রতা, বিভিন্ন জায়গায় কর্মীর অভাবে কাজগুলো না হওয়া, ন্যূনতম ১৫,০০০ টাকা মজুরি ও নির্মিয়মান আবাসন প্রকল্পগুলোতে নির্মাণ শ্রমিকদের সুরক্ষার দিকে নজর দেওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলো দাবি হিসাবে তুলে ধরা হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন নির্মাণ শ্রমিক ও সংগঠক সুভাষ অধিকারী, গোপাল পাল, নিতাই সমাদ্দার, ভিয়েত ও সংগঠনের জেলা সম্পাদক প্রদীপ সরকার।

বিলগ্নিকরণ—জনগণের সম্পদকে কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার অভিসন্ধি

কর্পোরেটের প্রিয়তম পাত্র নরেন্দ্র মোদী যখন দেশের কর্ণধার, তখন নয়া-উদারবাদী অর্থনীতির বিলগ্নিকরণ এজেণ্ডা কি দূরে থাকতে পারে? আর তাই ক্ষমতায় আসার সাড়ে তিন মাসের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার একদফা বড় আকারের বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত নিল। অর্থনীতি বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি, যার প্রধান স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী, তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিক্রিতে সবুজ সংকেত দিয়েছে। যে তিনটি সংস্থার শেয়ার বিক্রি হবে এবং সেগুলো থেকে কি পরিমাণ টাকা আসবে তা এইরকম—

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা	কত শতাংশ শেয়ার বিক্রি হবে	আনুমানিক যে টাকা পাওয়া যাবে (কোটি)
কোল ইণ্ডিয়া	১০.০০	২৩০০০
ও এন জি সি	৫.০০	১৮০০০
এন এইচ পি সি	১১.৩৬	২৮০০
মোট		৪৩৮০০

এবার অর্থমন্ত্রকের অধীন বিলগ্নিকরণ দপ্তর নিলামের মাধ্যমে ঐ শেয়ার বিক্রির বন্দোবস্ত করবে এবং এর জন্য সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে নিয়োগ করেছে। প্রসঙ্গত, এবারের এন ডি এ সরকার যেমন আলাদা করে একটি স্বতন্ত্র বিলগ্নিকরণ দপ্তর গঠন করেছে, তেমনি এর আগের এন ডি এ সরকারও একটি স্বতন্ত্র বিলগ্নিকরণ মন্ত্রক গঠন করেছিল যার মন্ত্রী ছিলেন অরুণ শৌরি। দুই এন ডি এ সরকারের এই উদ্যোগ দেখিয়ে দেয় যে, বিলগ্নিকরণের এজেণ্ডা এন ডি এ তথা বিজেপির কাছে কতটা গুরুত্ব বহন করে। তবে কেউ যদি মনে করেন এন ডি এ সরকারের বিলগ্নিকরণ উদ্যোগ এখানেই থেমে যাবে, তিনি ভুল করবেন। এর আগে বিলগ্নিকরণ হওয়া সুট্টি, বালকো ও হিন্দুস্তান জিংক সংস্থাগুলোর যে অবশিষ্ট শেয়ার এখনও সরকারের হাতে রয়েছে সেগুলো বিক্রি করে আরও ১৫০০০ কোটি টাকা তুলবে বলে সরকার স্থির করেছে। এছাড়া, এন টি পি সি, এস বি আই, আই ও সি, ভেল, গেইল ইত্যাদির মত ১০টি লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিক্রি করে ১ লক্ষ কোটি টাকা আয়ের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। আর, বাজার নিয়ন্ত্রক সেবির প্রস্তাব হল, সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থার সরকারি মালিকানার অংশকে তিন বছরের মধ্যে ৭৫ শতাংশে থামিয়ে আনতে হবে। অতএব, রাষ্ট্রের তথা জনগণের সম্পদকে বেসরকারি কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া তথা বিলগ্নিকরণের ঘোড়াকে এন ডি এ জমানায় ক্রমেই ছুটতে দেখা যাবে বলেই মনে হয়।

১৯৯০-এর দশক থেকে চালু হওয়া অর্থনৈতিক সংস্কারের নয়া-উদারবাদী নীতির অঙ্গ হিসাবেই বিলগ্নিকরণ কর্মসূচীর আত্মপ্রকাশ। এর সপক্ষে যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছিল যে, কোম্পানি পরিচালনার ভার সরকারের হাতে থাকলে সেখানে দক্ষতা ও আন্তরিকতার অভাব দেখা যায়। যে আমলা ও মন্ত্রীরা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো পরিচালনা করেন, সরকার তথা জনগণের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতেই প্রয়াসী হন। তাই কোম্পানি পরিচালনা থেকে সরকার সরে এলে এবং কোম্পানি পরিচালনার ভার বেসরকারি হাতে ন্যস্ত হলে তা পরিচালনায় নৈপুণ্য নিয়ে আসবে, কোম্পানির প্রতিযোগিতা ক্ষমতাকে ধারালো করবে এবং কোম্পানির মুনাফার বৃদ্ধি ঘটাবে। এই যুক্তিধারা বাজার শক্তিকে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে স্থাপিত করার অর্থনৈতিক দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু বেসরকারি পরিচালনা মানেই যে নৈপুণ্য নয়, ঐ পরিচালনার মধ্যে যে কোম্পানির অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের গ্যারান্টি নেই, সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাদের সঙ্কট তাকে সংশয়াতীতভাবে প্রতীয়মান করেছে। আমেরিকার দৈত্যাকার কোম্পানিগুলোকে দেউলিয়া হয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে সেখানকার সরকারকে ত্রাতা হতে হয়েছে, সংকট সামলাতে ভারতও সে পথের পথিক হয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রাক্তন প্রধান যোশেফ স্টিগলিৎজের কথায়, এই সংকট ''বাজারের ব্যর্থতা'' এবং এই সংকটের ফলে এত ''সম্পদ ধ্বংস হয়েছে'' যে যুদ্ধ ছাড়া আর কখনও তা ঘটেনি। বিলগ্নিকরণের বর্তমান উদ্যোগ অতএব জনগণের সম্পদে অনির্ভরযোগ্য কর্পোরেটকে পুষ্ট করে তোলার অভিসন্ধি ছাড়া অন্যকিছু নয়।

বিলগ্নিকরণের সপক্ষে আরও যুক্তি হল, তা সরকারি কোষাগারে অর্থ যোগায়, রাজস্ব ঘাটতি কমিয়ে এনে আর্থিক শৃঙ্খলাকে দৃঢ় করে। বিলগ্নিকরণ থেকে প্রাপ্ত অর্থ হল কর বহির্ভূত আয়। অর্থাৎ, কর বাবদ আয় থেকে সরকারি ব্যয় পুরোপুরি মেটানো সম্ভব হচ্ছে না, আর তাই ব্যয় নির্বাহের সংস্থান করতে, কোষাগারের ঘাটতি মেটাতে সরকারের কাছে গচ্ছিত জনগণের সম্পদকে বিক্রি করে দিতে হবে। যে সম্পদ এ দেশের জনগণ তাঁদের ঘাম-রক্ত দিয়ে তিলেতিলে গড়ে তুলেছেন, যা জনগণ তথা রাষ্ট্রের শক্তি ও ভবিষ্যৎ, তাকে সর্বগ্রাসী কর্পোরেট হাঙ্গরদের হাতে তুলে না দিয়ে আয়ের বিকল্প পন্থা সত্যিই কি কিছু নেই?

প্রথমত, যে শেয়ার বিক্রি করা হচ্ছে তা থেকে সরকার প্রতি বছর ভালো পরিমাণ ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ পায় যা সরকারি কোষাগারকে পুষ্ট করে। ঐ শেয়ার বিক্রি করে দেওয়ার অর্থ হল কোষাগারে অর্থ যোগানের একটি উৎসকে চিরতরে বিসর্জন দেওয়া। দ্বিতীয়ত, শেয়ার বিক্রির পাশাপাশি বিচার করুন প্রতি বছর কর ছাড় বাবদ কর্পোরেট ও ধনীদের দেওয়া উপঢৌকনের পরিমাণকে। এ বছরের বাজেটেই কর্পোরেট ক্ষেত্র ও ধনীদের দেওয়া ছাড়ের পরিমাণ হল ৫.৭২ লক্ষ কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ সাল থেকে দেওয়া কর ও অন্যান্য ছাড়ের পরিমাণ হিসেবে করলে তা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ৩৬.৫ লক্ষ কোটিতে! অর্থনীতিবিদ পি সাইনাথের মতে এই টাকা দিয়ে মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পকে ১০৫ বছর, গণবণ্টন ব্যবস্থাকে ৩১ বছর চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত। তৃতীয়ত, বিলগ্নিকরণ নীতি চালু হওয়ার পর থেকে বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে সরকার ১,০৭,৮০০ কোটি টাকা তুলেছে। জনগণের 'কল্যাণে'র জন্য এই পথে আয় কি অপরিহার্য ছিল? তাই যদি হয়, আজও দারিদ্র এত ভয়াবহ কেন, বুনিয়াদি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য পরিষেবা, সামাজিক সুরক্ষার হাল এত সঙ্গীন কেন? চতুর্থত, কিছু কিছু খাতে প্রতি বছর অপ্রয়োজনীয়ভাবে যে ব্যয়বৃদ্ধি হয়ে চলে সেগুলোতে রাশ টানলে তহবিলের অনাবশ্যক অনটনের অনেকটাই কমানো যায়। যথা, প্রতিরক্ষা খাতে (যে ক্ষেত্র অতি দুর্নীতিপ্রবণ, যাতে এ বছরে বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় ১২.৪ শতাংশ বৃদ্ধি করে ২২,৯০০ কোটি টাকা করা হয়েছে এবং যে ক্ষেত্রে উৎপাদনের ৪৯ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কাছে খুলে দেওয়া হয়েছে), পুলিশ খাতে, দেশসেবক সাংসদদের খাতে, আমলাদের বিশেষ সুবিধা খাতে, মন্ত্রী ও আমলাদের বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি খাতে ব্যয়কে অনায়াসেই কাট-ছাঁট করে আর্থিক শৃঙ্খলায় অবদান রাখা যায়। পঞ্চমত, কালো টাকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে এবং অবৈধ পথে বিদেশে সঞ্চিত কালো টাকাকে ফিরিয়ে আনার প্রতি আন্তরিক হলে তা সরকারি তহবিলকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করতে পারে। একটি হিসেব অনুযায়ী, ১৯৪৮ থেকে ২০০৮-এর মধ্যে ২৫ লক্ষ কোটিরও বেশী টাকা কালো পথে বিদেশে পাচার হয়ে গেছে এবং এর ৬৮ শতাংশই হয়েছে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী চালু হওয়ার পর। নির্বাচনের আগে এ নিয়ে মোদী কিছু শোরগোল তুললেও এখন এ বিষয়ে তাঁর সরকারের অনীহাই প্রকটরূপে দেখা যাচ্ছে। উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিলগ্নিকরণ কোন অপরিহার্য পন্থা নয়।

বিলগ্নিকরণ জনগণের জন্য কোন সুফল আনেনি। বিপরীতে, যে নীতি বিলগ্নিকরণের উৎস, সেই নয়া-উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতি জনগণের জীবন-জীবিকাকে বিপর্যস্ত করেছে, অর্থনীতিকে বেহাল করছে, একের পর এক পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতির জন্ম দিয়েছে। বাজার শক্তিকে অর্থনীতির চালিকাশক্তি করে তোলার এই নীতি, জিডিপি-কেই একমাত্র ধ্যানজ্ঞান করে তোলার এই নীতি এবং জনকল্যাণ দাঁড়িয়ে রয়েছে পরস্পরের বিপ্রতীপে। এখানে আমরা আর একবার স্টিগলিৎজকে স্মরণ করতে পারি—''পৃথিবীর অনেকাংশই যার পিছনে ছুটছে সেটাকে আমি বলি জিডিপি-র উপাসনা। ... জিডিপি-র বৃদ্ধি হলেও সমাজের অধিকাংশ মানুষ দুর্দশায় পর্যবসিত হতে পারে—আমেরিকায় এটা ঘটেছে। সংকটের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি-কে সম্মানজনক দেখাতো, কিন্তু সেটাকে ধরে রাখা সম্ভব ছিল না।'' অকুপাই আন্দোলনের ঘোষণাপত্রের অংশবিশেষের উল্লেখও এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না—''জনগণ এবং পৃথিবী থেকে সম্পদ নিংড়ে নেওয়ার অনুমতি কর্পোরেটগুলো নেয় না এবং ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ যখন অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর হাতে থাকে প্রকৃত গণতন্ত্র অর্জনও তখন সম্ভব হয় না। আমরা এমন একটা সময় আপনাদের সামনে এসেছি যখন কর্পোরেটগুলোই আমাদের সরকার চালাচ্ছে—যারা জনগণের চেয়ে মুনাফা, ন্যায়ের চেয়ে আত্মস্বার্থ, সমতার চেয়ে নিপীড়নকেই অগ্রাধিকারে রাখে।'' অকুপাই আন্দোলনের ঘোষণাপত্র আর আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে কি ভয়ঙ্কর মিল! যে অর্থনৈতিক দর্শন ও নীতির ওপর আমাদের রাষ্ট্র ভর করে রয়েছে, যা বলে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা পরিচালনা সরকারের কাজ নয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি সরকারের কর্তব্য নয়, যা জল-জমি-জঙ্গল-প্রাকৃতিক সম্পদকে জনগণের নিয়ন্ত্রণ থেকে কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার ওকালতি করে, যা কর্পোরেট স্বার্থ আর জাতির স্বার্থকে একাকার করে তোলে—জনগণের কল্যাণের জন্য সেই দর্শন ও নীতিটাকেই সর্বাগ্রে বিদায় জানানো দরকার।

- জয়দীপ মিত্র

অর্থনৈতিক মন্দা ঃ চলছে চলবে

২০০৮ সাল থেকে, লেম্যান ব্রাদার্সের দেউলে হয়ে যাওয়ার খবরে যে দুনিয়াজোড়া অর্থনৈতিক মন্দার সূচনা হয়েছিল, তার গ্রাস থেকে এখনো মুক্ত হয়নি বিশ্ব অর্থনীতি। বারংবার মন্দার অবসান হওয়ার আশা প্রকাশ করা হলেও বাস্তবে তা ঘটেনি। মন্দা থেকে উদ্ধারের যে দাওয়াই ইউরোপ-আমেরিকার ধনতান্ত্রিক উন্নত দেশগুলো প্রয়োগ করছে, যার প্রচলিত নাম আর্থিক সহজীকরণ (মানিটারি ইজিং); যেখানে দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলো অর্থনীতিতে টাকার যোগান বাড়ানোর বন্দোবস্ত করে ও মন্দার জন্য দায়ী সংস্থাগুলোকে মন্দা থেকে উদ্ধার করার দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের আরও বেশী সুযোগ সুবিধা দেয়, সেই বন্দোবস্ত খুব কার্যকরী হচ্ছে না। ইউরো জোনের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর অবস্থা এক্ষেত্রে উদ্বেগজনক। ২০১৪-র দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অর্থাৎ এপ্রিল-জুন সময়কালে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সর্ববৃহৎ অর্থনীতি, জার্মানির মোট আভ্যন্তরীণ উৎপন্ন (জিডিপি) ০.২ শতাংশ কমেছে; দ্বিতীয় বৃহৎ অর্থনীতি ফ্রান্সের জিডিপি বাড়েনি আর তৃতীয় বৃহৎ অর্থনীতি ইতালির জিডিপি-ও ০.২ শতাংশ কমেছে।

ইউরো জোনের দেশগুলোতে সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতির হার অত্যন্ত কম্ ০.৪ শতাংশ। আমাদের জনসাধারণ মুদ্রাস্ফীতির হার কম হলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন, কিন্তু পুঁজি চায় যথেষ্ট মূল্যবৃদ্ধির হার, নাহলে উৎপাদন বেশী হয় না। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটে না। তাই ইউরোপীয়ান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (ই সি বি) চাইছে মুদ্রাস্ফীতির হারকে অন্তত ২ শতাংশে নিয়ে আসতে। তার জন্য আবার ব্যাঙ্ক সুদের হার কমানো, বেসরকারি ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণ নেওয়াকে উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন প্রণোদনা জোগানোর আয়োজনের মত মানিটারি ইজিংকে আরও জোরদার করতে। ইউরো জোনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড, ই সি বি-র তুলনায় সহজ আর্থিক নীতি অনুসরণ করছে। দেখা গেছে যে ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ০.৮ শতাংশ এবং সেখানে মুদ্রাস্ফীতির হার ১.৯ শতাংশ। ফলে ই সি বি-র ওপরেও অনুরূপ মানিটারি ইজিং-এর নীতি গ্রহণের চাপ আসছে। কিন্তু সমস্যা হল সুদের হার কমিয়ে বা মানিটার ইজিং করে ঋণ প্রদান কৃত্রিমভাবে বাড়ালে তা সম্পদের দাম বাড়াবে। যা আবার ফাটকা অর্থনীতির ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করবে। এমনিতেই পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রত্যাশার ওপরে ভর করে চলে, তাতে ফাটকার ইন্ধন যোগালে তা নতুন করে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দার দিকে ফিরে যাবে এই সম্ভাবনা প্রবল। এমনই আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন আমাদের দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর রঘুরাম রাজন, যিনি ২০০৮-এর মন্দা সম্পর্কে ২০০৫ সালে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

সমস্যাটা অত্যন্ত জটিল। কেন না, সারা ইউরোপীয়ান ইউনিয়নেই এই মুহূর্তে মন্দা গেড়ে বসেছে। গ্রীস বা স্পেনের মত দেশগুলোতে যুবকদের মধ্যে বেকারির হার ৫০ শতাংশের বেশী; ইতালি, ক্রোয়েশিয়ার মত দেশে তা ৪০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ; পর্তুগাল ও শ্লোভাকিয়াতে ৩০ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ; ফ্রান্স, সুইডেন, বেলজিয়াম, আয়ারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরীর মত দেশগুলোতে ২০ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ; ইংল্যাণ্ডে ২০ শতাংশ ছুইছুই; ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ডসের মত দেশে ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ; আর জার্মানি ও অস্ট্রিয়াতে ১০ শতাংশের কিছু কম। ২০১৪ সালের যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে তাও তেমন আশার আলো দেখাচ্ছে না। অধিকাংশ দেশেই তা ১ থেকে ২ শতাংশের মধ্যে। আর তাও পূরণ হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ তৈরী হয়েছে। ২০০৭ সাল থেকে ২০১৪ পর্যন্ত সময়কালে ইউরো জোনের সামগ্রিক জিডিপি-র পরিমাণ ২০০৭-এর স্তরকে ছুঁতে পারেনি। ফলে সামগ্রিক এই ৭ বছরে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক। এমতাবস্থায় ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন নিয়েই প্রশ্ন ওঠা শুরু হয়েছে। ই সি বি-র ওপরে চাপ বাড়িয়ে আরও বেশী মানিটারি ইজিং-এর রাস্তায় নেওয়ার চেষ্টা চলছে, যা অবশ্যই ভবিষ্যতে মন্দার গ্রাসকে আরও শক্তিশালী করে তোলার সমস্ত সম্ভাবনাকে হাজির করবে। এই মন্দার সময়েও পুঁজির পৃষ্ঠপোষকরা সরকারকে অর্থনীতিতে সরাসরি হস্তক্ষেপের কেইনসীয় নীতি গ্রহণের সুপারিশ করছে না, কেননা তাতে উদার বিশ্বায়ানের অর্থনীতিটাই প্রশ্নের মুখে পড়বে। তাই অর্থনৈতিক মন্দা এখন শাঁখের করাত হয়ে উঠেছে, যেতেও কাটছে, আসতেও কাটছে।

- অমিত দাশগুপ্ত

পাওয়া যাচ্ছে ।। মূল্য ঃ ৩০ টাকা

চারু মজুমদার এবং তাঁর উত্তরাধিকার

‘‘সারে জাঁহা সে আচ্ছা’’ প্রথম গেয়েছিলেন প্রীতি সরকার

আজ থেকে প্রায় সাত দশক পূর্বে ইণ্ডিয়ান পিপলস্ থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনের (আই পি টি এ) আন্ধেরী (বম্বে) কমিউনে যাঁর মধুক্ষরা কণ্ঠে প্রাণ পেয়েছিল ‘‘সারে জাঁহা সে আচ্ছা’’, সেই প্রীতি সরকার গত ২৫ আগস্ট (পরে বিবাহ সূত্রে প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রায় নীরবে বিদায় নিলেন। ইণ্ডিয়ান পিপলস্ থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় স্কোয়াডের শেষ জীবিত শিল্পী। বয়স হয়েছিল প্রায় ৯১। কবি অমিয় চক্রবর্তী যাঁকে ‘‘যুগ সংকটের কবি’’ বলেছিলেন, সেই কিংবদন্তী প্রতীম উর্দু কবি মহম্মদ ইকবাল ১৯০৪ সালে লিখেছিলেন ‘‘সারে জাঁহা সে আচ্ছা/হিন্দোস্তাঁ হামারা’’। পণ্ডিত রবিশঙ্করের সুরারোপে জনপ্রিয় গীত হয়ে ওঠে ১৯৪৬ সালেই। এই কবিতাটি ভগৎ সিং, মহাত্মা গান্ধী এবং একাধিক অগ্রণী স্বাধীনতা সংগ্রামী সুর করে আবৃত্তি করতেন বলে শোনা যায়, কিন্তু তাকে গীতে রূপান্তরিত করেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। তিনি তখন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি আই)-এর সাংস্কৃতিক গণসংগঠন আই পি টি এ-র সাথে যুক্ত এবং তাঁর সঙ্গীত পরিচালক। সস্ত্রীক (অন্নপূর্ণা) ও শিশুপুত্র শুভেন্দুকে নিয়ে থাকতেন বম্বের (মুম্বাই নাম হয়েছে ১৯৯০-এর দশকে) মালাড-এ। নিয়মিত যেতেন আই পি টি এ-র আন্ধেরি কমিউনে। সঙ্গে আসতেন অন্নপূর্ণা ও শুভেন্দুশঙ্কর। সি পি আই-এর সাধারণ সম্পাদক এবং আই পি টি এ-র স্রষ্টা পূরণ চাঁদ যোশীর অনুরোধের জন্যেই তিনি সুর দেন ‘‘সারে জাঁহা সে আচ্ছা’’। প্রথম সেতারে তুলে সেটা প্রীতিদিকে শেখান তাঁর মালাডের ফ্লাটে গানটি। প্রীতিদির থেকে আই পি টি এ সেন্ট্রাল স্কোয়াডের অন্য শিল্পীরা তুলে সেটিকে কোরাসে পরিবেশন করেন।

রবিশঙ্করের প্রয়াণের পরে এক সাক্ষাৎকারে প্রীতিদি নিজেই দৈনিক ‘কালান্তর’-এ বলেছিলেন, ‘তিনি ছিলেন আমাদের সবার রবুদা। তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণাকে নিয়ে আসতেন। আমার গলায় গানটি রবুদা তুলে দেন প্রথম। খুব যত্ন নিয়ে শেখাতেন। তারপরে আমার থেকে গানটি আই পি টি এ-র কেন্দ্রীয় স্কোয়াডের জন্য সদস্যরা তুলে নেন। থাকতেন মালাডে। প্রায়ই তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণা ও পুত্র শুভেন্দুশঙ্করকে নিয়ে আসতেন। আমরা শুভ বলে ডাকতাম।’

রাজশাহীর (এখন বাংলাদেশে) সুপরিচিত সংস্কৃতিপন্থী সরকার পরিবারের মেয়ে প্রীতি। তাঁর কাকা জগন্নাথ সরকার (একদা সি পি আই-এর সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য সংগঠন বিহারের সম্পাদক)-এর অনুপ্রেরণায় ও রাজশাহীর পার্টি সংগঠক শুভ্রাংশু মৈত্রের সংস্পর্শে এসে কলেজ জীবনেই সি পি আই-এর ছাত্র সংগঠন অল ইণ্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশনে যোগ দেন। সুকণ্ঠী হিসেবে রাজশাহীতেই তাঁর নামডাক ছিল। সবাই ডাক নামেই তাঁকে জানত। খুকু সরকার। কাজেই পার্টি ও উপনিবেশবাদ-বিরোধী আন্দোলনে তাঁর গান তাঁকে সুপরিচিত করেছিল অচিরেই। সেই সময় এক পারিবারিক ট্র্যাজেডি ঘটে—তাঁর পিতার জীবনাবসান হয়। তাই স্নাতক শিক্ষা শেষ করে মাকে নিয়ে বম্বে চলে যান ও সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে আই পি টি এ-তে যুক্ত হন।

তাঁর মামা বিনয় রায় (টুকু মামা) তখন আই পি টি এ-র কেন্দ্রীয় নেতাদের অন্যতম। তাই তাঁর স্থান হল কেন্দ্রীয় স্কোয়াডে। আই পি টি এ প্রযোজিত খাজা আহমদ আব্বাস পরিচালিত ও রবিশঙ্কর সুরারোপিত এবং বাংলার দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষিতে রচিত ‘ধরতি কে লাল’ ছবিতে প্রীতিদি গান গেয়েছিলেন। ছবিটি কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ১৯৪৬ সালে পুরস্কার পেয়েছিল। সে বছরেই আই পি টি এ প্রযোজনায় চেতন আনন্দের নির্দেশনায় ও রবিশঙ্করের সঙ্গীত পরিচালনায় আর একটি ছবি ‘‘নীচা নগর’’-এও প্রীতিদি গেয়েছিলেন।

শুধুমাত্র ‘‘সারে জাঁহা সে আচ্ছা’’ সুরোরোপ করাই আই পি টি এ-তে রবিশঙ্করজীর একমাত্র অবদান নয়। প্রীতিদি ১৯৯৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ গণনাট্য সংঘের পঞ্চাশতম বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে লিখেছেন ঃ ‘‘সারা ভারতের লোকসঙ্গীত থেকে রসদ সংগ্রহ করে গানগুলোতে সুরারোপ করা হত। ১৯৪৬ সালের দিকে পণ্ডিত রবিশঙ্কর এসে যোগ দিলেন। তাঁরই সুরে ‘‘অমর ভারত’’ ব্যালে পেল ছন্দ। এই দুই ধারা মিলিয়ে এবং সুযোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে গণনাট্যের সৃষ্টি সেদিন খুবই উচ্চমানের হয়েছিল। সেদিন মহারাষ্ট্রের ‘পোয়াডা’ প্রকাশ পেয়েছিল বাংলা ভাষায়। আবার বাংলা লোকসঙ্গীতের সুরে সমৃদ্ধ হত হিন্দী ভাষা। এইভাবেই সারা ভারতের সংস্কৃতি সেদিন যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল।’’

এইসবের পিছনে ছিল পূরণ চাঁদ জোশীর (পি সি জোশী নামেই বেশী পরিচিত ছিলেন) মুক্ত চিত্ত ও সাংস্কৃতিক চেতনা। রবিশঙ্করের সঙ্গে সামিল হয়েছিলেন বিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সরোদীয়া তিমিরবরণ বা নৃত্য শিল্পী শান্তি বর্ধনের মত প্রতিভা।

প্রীতিদির ঠাকুর্দা কুমুদ সরকারেরা ছিলেন সাত ভাই আর তাঁদের একজন বিশ্বখ্যাত ইতিহাসবিদ আচার্য যদুনাথ সরকার। জগন্নাথ সরকারের বাবা অখিলনাথ আর এক ভাই, যিনি পাটনা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের স্ত্রীরোগ চিকিৎসা বিভাগের প্রধান ছিলেন। জগন্নাথ সরকার মেধাবী ছাত্র ছিলেন, ভাল সেতার বাজাতেন। কিন্তু তাঁর বিবেক তাঁকে ঠেলে দিচ্ছে সমাজ বদলের সড়কে। একবার জগন্নাথ সরকার নিখোঁজ। বাড়ির সবাই ভাবলেন তাঁর এক দাদার মত তিনিও সন্ন্যাসব্রত নিয়েছেন। না, তিনি সি পি আই-তে যোগ দিতে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে গিয়েছিলেন। পার্টি তখন বেআইনি। কাকার এই সংকল্প তাঁকে সাম্যবাদের দিকে নিয়ে গেল।

প্রীতিদি আই পি টি এ-র কেন্দ্রীয় স্কোয়াড ভেঙ্গে যাওয়ার পরে কলকাতায় চলে এলেন। সে আর এক ঘটনা। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পি সি যোশী নিজেই। সেখানে তুখোড় ছাত্র নেতা রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হল প্রণয় ও পরিণয়। তিনি ছিলেন সি পি আই-এর প্রভাতী দৈনিক স্বাধীনতার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আর সম্পাদকমণ্ডলীর প্রধান ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী।

প্রীতিদির সাথে একঘন্টা কাটিয়ে ছিলাম তাঁর বড় ছেলে পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটে রবিশঙ্করের জীবনাবসানের পরে। সেসব দিনের কথা শুনতে গিয়েছিলাম অনুজ সাংবাদিক চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য ও এককালে মাওবাদী ক্যাডার, পরে আলোকচিত্রী বাপ্পাদিত্য ভট্টাচার্যের সঙ্গে। পার্থ আর তাঁর স্ত্রী নীলাঞ্জনা (ইতিহাসের অধ্যাপিকা) যোগ দিয়েছিলেন। প্রীতিদি বলছিলেন আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলাম। মাঝে মাঝে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছিলাম। ভগৎ সিং-এর প্রসঙ্গ উঠতেই বাপ্পা ও চন্দ্রশেখর আলটপকা বলে উঠল, ভগৎ সিং-এর বিখ্যাত গানটার দু-এক কলি শোনাবেন। নব্বই ছোঁয়া অসামান্য রমণী যখন গেয়ে উঠলেন সরফারোসি কি তমান্না আব হামারে দিল মে হ্যায়/দেখনা হ্যায় জোর কিতনা বাজু-এ কাতিল মেঁ হ্যায়। বিস্ময়স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম কয়েক মুহূর্তের জন্যে। এই বয়সেও গলায় এমন মধু ঝরতে পারে আমাদের কল্পনার অতীত ছিল।

পঞ্চাশ দশকে পার্টি ছেড়ে দেন, কিন্তু আজীবন সি পি আই-এর গভীর সমর্থক ছিলেন। কিন্তু সি পি আই-এর এক নেতার সি পি আই (এম)-এর লেজুড়বৃত্তিতে ক্ষুব্ধ ছিলেন। ‘এক সাথে চলা ঠিক আছে, কিন্তু সারমেয়সুলভ বশ্যতা কেন’।

আসার সময় বলে এসেছিলাম, আবার আসব সেইসব দিনের কথা শুনতে। সানন্দে সম্মতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠেনি, তার অন্যতম কারণ নিজের গড়িমসি, এজন্য বেদনা রয়েই গেল।

- শঙ্কর রায়

চলে গেলেন বর্ষিয়ান বাম কৃষক নেতা বিনয় কোঙার

প্রবীণ সি পি আই (এম) নেতা ও কৃষক নেতা বিনয় কোঙার গত ১৪ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। বিগত কিছুদিন যাবত তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেই অবস্থাতেই তাঁর দেহাবসান ঘটেছে। তিনি পরিবারে রেখে গেছেন স্ত্রী ও দুই কন্যা, দুই পুত্র সহ অন্যান্য পরিজনদের।

কমরেড বিনয় কোঙারের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন সি পি আই (এম) নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন বাম ও গণতান্ত্রিক দল এবং গণসংগঠনের নেতৃত্ব। সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের পক্ষে পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কার্তিক পাল শোকপ্রকাশ করে বলেন, বিনয় কোঙারের মৃত্যুতে সমগ্র বাম আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলনের ক্ষতি হল। তবে সিঙ্গুর আন্দোলনের প্রতি নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণ এবং নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রতি কিছু বিরূপ মন্তব্য যা তিনি তাঁদের দলের গৃহীত অবস্থান অনুযায়ী করেছিলেন, অপ্রত্যাশিত ছিল।

সি পি আই (এম) রাজ্য দপ্তরে গিয়ে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে পার্টির পক্ষ থেকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন কমরেড কার্তিক পাল, বাসুদেব বোস ও সুরেশ মন্ডল।

প্রয়াত বিনয় কোঙারের রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস দীর্ঘ ছয় দশকেরও বেশী সময়কালের। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ। তারপর সি পি আই কর্মী থেকে সি পি আই (এম) নেতা হয়ে ওঠার তাঁর বিস্তৃত ইতিহাস বহুল পরিচিত। তাঁকে মোট ছয় বছরেরও বেশী কারাজীবন ভোগ করতে হয়েছিল। বক্তব্য রাখা ও লেখার ক্ষেত্রেও তাঁর নিজস্ব ঘরানা ছিল। বর্ধমান জেলার মেমারী তাঁর জন্মস্থান, আর ঐ জেলা সদরের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই তিনি চিরশায়িত থাকবেন।

পি ডি এস নেতা সৈফুদ্দিনের অকালপ্রয়াণ

কর্কটরোগের সাথে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে অকালে প্রয়াত হলেন পি ডি এস নেতা সাথী সৈফুদ্দিন চৌধুরী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৬২ বছর। গত চার বছর যাবত তিনি জীবন-মরণ যুদ্ধ করছিলেন। কিন্তু অবশেষে চিকিৎসা প্রয়াসের হাতের বাইরে চলে গেলেন ১৪ সেপ্টেম্বর। এই ধরণের অকালপ্রয়াণ আরও দুঃখজনক। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই পুত্র সহ সংগ্রামের সাথীদের। কলকাতায় পি ডি এস-এর কেন্দ্রীয় দপ্তরে সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে বাসুদেব বোস ও জয়তু দেশমুখ গিয়ে শায়িত কমরেড সৈফুদ্দিন চৌধুরীর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রয়াত বিনয় কোঙারের মতই সৈফুদ্দিনেরও জন্মভূমি বর্ধমান জেলার মেমারী, সি পি আই (এম) মাধ্যমেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু, এস এফ আই সম্পাদক হওয়া, সি পি আই (এম) ব্যানারে একাধিকবার লোকসভা সদস্য হন; অবশ্য ’৯০ দশকের শেষের দিকে সি পি আই (এম) নেতৃত্বের সাথে মতান্তরবশত তাঁদের ভাষায় ‘‘সম্মানজনক বিচ্ছেদ’’ ঘটে যায় এবং তারপরে সৈফুদ্দিন প্রমুখরা গঠন করেন পি ডি এস। গণতান্ত্রিক সমাজবাদী দলের এই প্রতিষ্ঠাতা নেতার অকালপ্রয়াণে আমরা গভীর শোকের সমান অংশীদার।

শোক সংবাদ

গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়া এলাকার কমরেড প্রলয় পাল টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন ভুগে অবশেষে গত ১১ সেপ্টেম্বর চলে গেলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। পরিবারে স্ত্রী ও এক নাবালক পুত্র আছে।

’৭০-এর দশকের শুরু থেকে নকশালবাড়ীর আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে গাইঘাটা ব্লকে চাঁদপাড়া অঞ্চলে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে প্রলয় পাল ছিলেন সক্রিয় একজন কর্মী। মূলমন্ত্র ভূমিহীন কৃষকদের সাথে মেশা, সমাজ বদলের রাজনীতি বোঝানোর চেষ্টা, খাস জমিতে গরিবদের বসানো, বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, পাড়াতে পার্টির গোপন মিটিংয়ের দায়িত্ব নেওয়া----এসবই ছিল তাঁর কাজ। তার পর পারিবারিক কারণে ঘরবাড়ী ছেড়ে বেলুড়ে দীর্ঘবছর ছিলেন জীবিকার প্রয়োজনে। সেখানেও পার্টির সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলেন। পুনরায় ২০০০ সালে চাঁদপাড়ায় ফিরে আসেন। পার্টির সাথে যুক্ত হয়ে পাড়ায় কিছু কিছু কাজ সাধ্যমত করতেন, মিটিং, মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে পার্টির কমরেডরা উপস্থিত হন। লোকাল কমিটির সম্পাদক কার্তিক দে, বর্ষীয়ান কমরেড দীনবন্ধু দাস, গ্রামের শাখা সম্পাদক শঙ্কর মণ্ডল, বলাই দাস, রাজ্য কমিটি সদস্য কৃষ্ণ প্রামাণিক সহ পাড়ার দরদীরা প্রয়াত প্রলয়দাকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানান। সেকাটি শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

শহীদ স্মরণ

’৬৯ সালে নকশালবাড়ি আন্দোলনের শহীদ কমরেড গোপাল ঘোষের শহীদ দিবস গত ১১ সেপ্টেম্বর হুগলীর দলীয় কার্যালয়ে পালিত হয়। পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর উপস্থিত সদস্যরা গোপাল ঘোষ সহ সমস্ত শহীদদের স্মরণে নীরবতা পালন করেন। শহীদদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার শপথ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে কর্মসূচী শেষ করা হয়।

প্রমোটার চক্রের বিরুদ্ধে বেহালায় মিছিল

সিরিটি কালিতলা অঞ্চলে প্রমোটার চক্রের খালি জমি আত্মসাৎ করার বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণ ও ক্লাবের সভ্যরা একজোট হয়ে প্রতিরোধ ও বিক্ষোভ মিছিল করেন। প্রমোটার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এসে এই জমি দখল করতে চেয়েছিল। এর বিরুদ্ধে এলাকার সাধারণ মানুষ রুখে দাঁড়ান। সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের পার্টি কর্মীরা ও সমর্থক-দরদীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এই জমি জনগণের জন্য সংরক্ষিত করার দাবিতে কলকাতা পৌরসভার নিকট স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে দাবিসনদ পেশ করা হয়।

কোমাগাতামারু আন্দোলনের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে
২৪ সেপ্টেম্বর, জমায়েত ও শ্রদ্ধা নিবেদন
বজবজ কোমাগাতামারু শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ—বেলা ২টা
আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—বেলা ৩টা, প্রধান বক্তা ঃ দীপঙ্কর ভট্টাচার্য
বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী (বজবজ পুরাতন রেল স্টেশনের কাছে)
আয়োজনে ঃ পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদ

শুভ্রদীপ চক্রবর্তীকে মনে রেখে

স্তব্ধ হল বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর

''শুভ্রদীপ চক্রবর্তী ও মীরা চৌধ্রী নির্মিত 'ইন দিনো মুজফফরনগর' ইতিহাসে নথিভুক্ত হল প্রধানমন্ত্রী মোদীর জমানায় প্রথম নিষিদ্ধ তথ্যচিত্র হিসাবে। ২০১৪-র ৩০ জুন কণ্ঠরোধ করার আদেশ দেওয়া হল। আজ আমরা ফিল্ম সার্টিফিকেশন অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে আমাদের অভিযোগ প্রতিকারের আবেদন জানালাম। বিনা যুদ্ধে আমরা হাল ছাড়ব না।''

ভারতের অন্যতম সাহসী তথ্যচিত্র নির্মাতাদের একজন শুভ্রদীপ চক্রবর্তীর এই ছিল ফেসবুক পোস্টকরা শেষ কথা। জড়বৎ সেন্সরশিপ বোর্ডের আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে এবং মানববিদ্বেষী প্রত্যাখ্যানের যন্ত্রণা নিয়ে সংগ্রামরত শুভ্রদীপ ২৫ আগস্ট মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

২০০২ সালে শুভ্রদীপ যখন তার প্রথম তথ্যচিত্র গোধরা তক তৈরী করেন তখন তার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি প্রথমে ছিলেন একজন সাংবাদিক কিন্তু গোধরার ভয়াবহতা তাকে চলচ্চিত্রকারে পরিণত করে। ৫৯ জন হিন্দু ট্রেনযাত্রীর পুড়ে মরার ঘটনার ওপর তিনি তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেন। গুজরাট সরকার সেই পোড়া শবদেহগুলো সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য অনুমতি দেয় এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যখন সুসংগঠিত নিধন পর্ব চলে তখন সরকার তা না দেখার ভান করে এই অভিযোগ শোনা যায়। মুসলিমরা ট্রেনের কামরায় পেট্রোল ঢেলেছে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে। গোধরা তক তথ্যচিত্রে আদালতের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদির ওপর জোর দেওয়া হয় যা উপরোক্ত তত্ত্বকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায় এবং এর সাথে মুসলিমদের সুপরিকল্পিতভাবে দানবসদৃশ্য দেখানোর প্রচেষ্টাকেও প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলে। বিজেপি শাসিত গুজরাট এবং কেন্দ্র একইসাথে ঘোষণা করে গুজরাট ইসলামি সন্ত্রাসের জন্মস্থল। এরপর অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে থাকে। ঐ বছর অক্ষরধাম মন্দিরে ''মুসলিম সন্ত্রাসবাদী''রা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে এবং ৩৩ জনকে হত্যা করে। ২ জন আক্রমণকারী নিহত হয়। ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, এর মধ্যে ৩ জনের ফাঁসির আদেশ হয়। ২০১৪-র মে মাসে সুপ্রীম কোর্ট ঐ ৬ জনকেই বেকসুর খালাস দেয় এবং গুজরাটের পুলিশের মেকি তদন্তের রাশ টেনে ধরে।

গুজরাটে একের পর এক সংঘর্ষ হত্যার ঘটনা ঘটে। শুভ্রদীপের পরবর্তী ছবি ছিল গেরুয়া এজেণ্ডার সাথে সংঘর্ষ, যে ছবিতে চারটি ''সংঘর্ষ''-র মধ্যে সবথেকে কুখ্যাত হল ২০০৪-এ ইশরাত জাহান এবং অন্যান্য, ২০০৫-এ সোহরাবুদ্দিন এবং অন্যান্যদের হত্যার ঘটনা। প্রত্যেকটি মামলাতেই প্রশাসন দাবি করে মৃত মুসলিম ব্যক্তিরা হল সন্ত্রাসবাদী যারা নরেন্দ্র মোদীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। শুভ্রদীপের বুদ্ধিদীপ্ত নিখুঁত তদন্ত মুখোশ খুলে দেয় কিভাবে প্রত্যেকটি সংঘর্ষ আসলে ঠাণ্ডা মাথায় খুনের ঘটনা। শেষ পর্যন্ত আদালত সরকারিভাবে বিচারার্থে অবগত হয় এবং কুচক্রীদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাগারে পাঠায় যার মধ্যে ছিল উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার ডি জি বানজারা এবং মোদীর ডান হাত অমিত শাহ্। এদের মধ্যে কেউ কেউ আজ মুক্ত কিন্তু ভুয়ো সংঘর্ষ যে হয়েছিল এ ব্যাপারে খুব কম লোকেরই সন্দেহ আছে।

জয়পুরে এবং ভোপালে শুভ্রদীপকে ছবি প্রদর্শনের সময় শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হয়, অল্পের জন্য মারাত্মক আঘাত থেকে তিনি রক্ষা পান। কিন্তু তাঁর সাহস এবং দৃঢ়তা থেকে তিনি কখনও সরে যাননি। ২০১২ সালে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দুটি ছবি করেন, একটি হল 'কোর্ট বহির্ভূত বন্দোবস্ত'—যার বিষয়বস্তু হল মানবাধিকার রক্ষাকারীর অগ্নিপরীক্ষা যেমন শহীদ আইনজীবী শাহীদ আজমি। অন্যটি হল 'ঝড়ের পর'—এর বিষয়বস্তু হল কয়েকজন যুবক সন্ত্রাসবাদী অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়েও মর্মাঘাত ও কলঙ্কের মুখোমুখি।

আমরা ২০১৪ এপ্রিলে মুম্বাইয়ে বিকল্প @ পৃথ্বী-তে শুভ্রদীপকে আমন্ত্রণ জানাই তার সর্বশেষ কাজ 'ইন দিনো মুজফফরনগর' দেখানোর জন্য। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সদ্য বিবাহিত স্ত্রী মীরা চৌধ্রী যিনি একাধারে তাঁর সঙ্গীনী, সহ-পরিচালকা। ওঁরা প্রেম ভালোবাসায় ছিলেন অল্পবয়সীদের মতোই আসক্তিতে ভরা। প্রদর্শনের পর প্রশ্নোত্তর পর্বের সময় শুভ্রদীপ চিত্রগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্যামেরার সমস্ত কৃতিত্ব দেন মীরাকে। ''মীরা থাকলেই কিছু না কিছু ঘটে, উনি হচ্ছেন আমার সৌভাগ্যের মন্ত্র।''

এই তথ্যচিত্র ছিল আগের সবগুলোর থেকে অন্যরকম। রূপের দিক থেকে সর্বদাই মূল বিষয়ে কেন্দ্রীভূত এবং মানব হিতবাদীমূলক। ক্যামেরা এবং শব্দ অনবদ্য, ছবিতে বহু বিষয় সমন্বিত হয়েছে এবং শুধুমাত্র অপরাধীদের জঘন্য কর্ম চিত্রায়িত হয়েছে তা নয় সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবকে প্রতিরোধে সামিল সাধারণ ব্যক্তি ও সম্প্রদায়গুলোর ঘটনাও চিত্রায়িত করা হয়েছে। জাঠ ও মুসলিমরা ঐতিহাসিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে গেছেন এমনকি জাতীয় দ্বন্দ্বের সময়ও সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব বজায় রেখেছেন। শুভ্রদীপের স্ত্রী মুজফফরনগরের একজন জাঠ যিনি তাঁর সমস্ত সহযোগিতা এবং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সাহায্য করেছেন। সর্বোপরি, ছবিটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দাঙ্গার ঘটনার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে যে কিভাবে ন্যায়নীতিবর্জিত ধূর্ত ব্যক্তিরা একটা সাধারণ ছোট ঘটনাকে দাঙ্গায় পরিণত করে এবং তার ফলে সদ্ভাবসম্পন্ন প্রতিবেশীরা কিভাবে একে অপরের হন্তারক হয়ে ওঠে।

আমরা এপ্রিলের শেষে যখন তথ্যচিত্রটি দেখছিলাম নির্বাচনের তখন প্রস্তুতি চলছে এবং দেওয়ালের লিখনও পড়া যাচ্ছে। সংবাদপত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলোতে তখন শুরু হয়েছে 'ধর্ম-নিরপেক্ষতা'-র ওপর আক্রমণ।

দেশের শাসক যেই হোন না কেন সেন্সরবোর্ড সর্বদাই কড়া। কখনও কখনও বেশি কঠোর। ২০০২ সালে আমাদের পরমাণু-যুদ্ধ বিরোধী ও শান্তির ছবিকেও সি বি এফ সি ছাড় (শংসাপত্র) দেয়নি। ওদের ২১টি সংশোধনের প্রস্তাব ছিল—প্রথমটি হল ''নাথুরাম গডসে দ্বারা গাঁধীকে গুলি করার দৃশ্য বাদ দিতে হবে''। ইতিহাসের বইগুলোতে তখন নতুন করে লেখা হচ্ছে গাঁধীকে একজন পাগল হত্যা করে। সেন্সর বোর্ড তাদের নির্দেশিকা ২(১২) অনুযায়ী তাদের প্রস্তাবকে ন্যায্যতা দিয়েছে—যাতে বলা আছে ''ছবিতে বা কথায় বর্ণ, ধর্ম বা অন্য কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণাব্যাঞ্জক কিছু পরিবেশন করা যাবে না''। একবছর পরে হাইকোর্ট আমাদের ছবিকে কোন সংশোধন ছাড়াই ছাড়পত্র দেওয়ার আদেশ দেয়।

সি বি এফ সি ঐ একই ধারা প্রয়োগ করে 'ইন দিনো মুজফফরনগর'-কে নিষিদ্ধ করে। অ্যাপিটে ট্রাইব্যুনালও তাতে সম্মতি দেয়। তাদের রায়ে বলা হয়, ''এই চিত্রটি একটি রাজনৈতিক দলের (বিজেপি) ও তার সর্বোচ্চ নেতৃত্বের প্রতি অত্যাধিক সমালোচনাপূর্ণ এবং এমন একটা ধারণার অবতারণা করা হয়েছে যাতে মনে হয় উক্ত দলটি সাম্প্রদায়িক গোলযোগে জড়িত আছে।'' মনে হচ্ছে তদন্তমূলক সাংবাদিকতাকেও পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হবে।

শুভ্রদীপ, সামনে তিমির রাত্রি, কিন্তু সময় বদলাবে। সারা দেশ একদিন না একদিন তাদের প্রকৃত নায়কদের স্মরণ করবেই—যে নায়করা নিজেদের জাতপাতের সংকীর্ণ কারণে লড়াই করেনি বরং সত্য ও মানবতার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন—ওঁরা মৃতুঞ্জয়ী।

- আনন্দ পট্টবর্ধন

(টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে ভাষান্তরিত)

আয়ালা (সারা ভারত কৃষিমজুর সমিতি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কাউন্সিল বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত

১৪ সেপ্টেম্বর নদীয়ার ধুবুলিয়াতে অনুষ্ঠিত হল সারা ভারত কৃষিমজুর সমিতির রাজ্য কাউন্সিল বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আয়ালার জাতীয় সহ-সভাপতি কমরেড স্বদেশ ভট্টাচার্য। বৈঠকে উপস্থিত রাজ্য কাউন্সিলররা বিস্তৃত আলোচনার পর এই রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গ্রামে গ্রামে কৃষিমজুর সহ গ্রামীণ মেহনতীদের অধিকারগুলো রক্ষায় উদ্যোগকে আরও প্রসারিত করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্তগুলো—(১) রাজ্যে সারদা চিটফাণ্ডকে কেন্দ্র করে শাসক দলের নেতামন্ত্রীরা জড়িয়ে পড়ায় যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করতে আগামী ২০-২৫ সেপ্টেম্বর গ্রামে গ্রামে এক প্রচারাভিযান সংগঠিত করা হবে। ২২ সেপ্টেম্বর কলকাতায় গণমঞ্চের মহামিছিলেও অংশগ্রহণ করা হবে। সারদা কেলেঙ্কারি ছাড়াও এই প্রচারাভিযানে এন আর ই জি এ-র বকেয়া অর্থ অবিলম্বে আদায় করা সহ কেন্দ্রীয় সরকারের এন আর ই জি এ বিরোধী অবস্থানকে তুলে ধরা হবে। স্থানীয় বিভিন্ন ইস্যুগুলো সহ, শৌচাগার নির্মাণে দুর্নীতি ও অব্যবস্থা, পঞ্চায়েতী ট্যাক্স বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য বীমা, তপসিলি জাতি/উপজাতি শংসাপত্র প্রদানে হয়রান করা, পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা আইন ২০১৩ কার্যকর করা, ন্যূনতম মজুরি ২০৬ টাকা কার্যকর করা, বর্গা ও পাট্টা প্রশ্ন তুলে ধরার সিদ্ধান্ত হয়। (২) এই সমস্ত ইস্যুগুলোতে ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরে আগামী ১২ থেকে ১৪ নভেম্বর বিক্ষোভ কর্মসূচী সংগঠিত করা হবে। (৩) কৃষিমজুর সমিতির রাজ্য কমিটি গত অশোকনগর বৈঠকে ন্যূনতম মজুরি ২০৬ টাকার দাবিতে আগামী ফসল কাটার মরশুমে কৃষিমজুর ধর্মঘট সংগঠিত করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই সিদ্ধান্তকে জোরালোভাবে কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। (৪) আগামী বছর ২০১৫ সালে ২১-২২ মার্চ নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরিতে অনুষ্ঠিত হবে সংগঠনের পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন। তার আগে জানুয়ারিতে গ্রাম/অঞ্চল/ব্লক কমিটি এবং ফেব্রুয়ারিতে জেলা সম্মেলন সংগঠিত করতে হবে।

জাতীয় সমিতির সিদ্ধান্ত—সদস্য সংগ্রহ চলবে ২টি পর্বে—(ক) আগামী অক্টোবরের মধ্যে ১ম পর্ব এবং জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে ২য় পর্ব।

... ছাত্ররা সাবাশ! *একের পাতার পর*

মিলিয়েছেন অধ্যাপক-শিক্ষকবৃন্দ। সামিল হয়েছেন সুশীল সমাজের প্রতিবাদী পক্ষের শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা—কৌশিক সেন, মীরাতুন নাহার, সমীর আইচ, সুজাত ভদ্র প্রমুখ; কলকাতা নাগরিক সমন্বয়-এর অমলেন্দু ভূষণ চৌধুরী। সাথ দিয়েছেন সি পি আই (এম এল) লিবারেশানের ঢাকুরিয়া-যাদবপুর অঞ্চলের নেতা-কর্মীবৃন্দ। পাশে দাঁড়িয়েছে প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয় সহ কলকাতার আরও অনেক কলেজের ছাত্রছাত্রীরা।

প্রতিবাদে প্রতিবাদ মিলিয়ে কবি শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট প্রাক্তন অধাপকবৃন্দ সংবাদজগতে সোচ্চার।

১৬-১৭সেপ্টেম্বরের মাঝরাতে পুলিশ আর চপ্পল পায়ে 'উর্দ্দীবিহীন পুলিশ' থুড়ি তৃণমূলের যৌথ বাহিনী বিগত বামফ্রন্ট আমলের অপারেশান নন্দীগ্রাম স্টাইলের মতই অপারেশান জে ইউ হান্ট চালালো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা এর দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না।

দিল্লীতে জে এন ইউ-তে আইসা-র নেতৃত্বে ছাত্ররা ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে সংহতি বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। বিক্ষোভ সংগঠিত হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্গভবনের সামনেও। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা-প্রবণতা একটা স্পষ্ট বিভাজিকা টেনে দিয়েছে। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও রাজ্যের শাসকপক্ষের অন্যায়-অবিচার-নামিয়ে আনা দমন-সন্ত্রাস, বিপরীতে ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত বিচারের দাবি-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। আসুন, সরব-সক্রিয় হই ছাত্রদের সপক্ষে।

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
ইংরাজী সাপ্তাহিক
''আপডেট''
গ্রাহক মূল্য ঃ ৫০ টাকা

ধিক্কার দিবস *তিনের পাতার পর*

শিলিগুড়িতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম থেকে এক সুসজ্জিত বিক্ষোভ মিছিল শহর পরিক্রমা করে। হরেন মুখার্জী সরণী, হিলকার্ট রোড, বিধান রোড হয়ে ফিরে আসে মিছিল শুরুর চত্বরে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সি পি আই (এম এল) রাজ্য নেতৃত্বের পবিত্র সিংহ, অভিজিৎ মজুমদার, জেলা নেতৃত্বের শরৎ সিংহ, লালু ওরাওঁ, মোজাম্মেল হক, কল্লোল চক্রবর্তী, মুক্তি সরকার, মীরা চতুর্বেদী, রুবি সেনগুপ্ত, ছাত্রনেতা প্রদীপন গাঙ্গুলী, শাশ্বতী সেনগুপ্ত।

''আজকের দেশব্রতী'' সম্পাদকমণ্ডলী
অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী,
জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত,
সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

● বন্ধ কারখানা খোলার দাবিতে ● চা বাগানে অনাহার মৃত্যুর প্রতিবাদে ● দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে ● সারদা আর্থিক কেলেঙ্কারিতে যুক্ত নেতা-মন্ত্রীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ● ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে

গণমঞ্চ-র আহ্বানে ২২ সেপ্টেম্বর (সোমবার)

বিক্ষোভ মিছিল ও সভা

মিছিল শুরু ঃ কলেজ স্কোয়ার, বেলা ১২.৩০টা ।। সভা ঃ ওয়াই চ্যানেল, ধর্মতলা
বক্তা ঃ দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, রেজ্জাক মোল্লা, প্রসেনজিৎ বসু, অমিতাভ চক্রবর্তী, কুণাল চট্টোপাধ্যায়

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ৩ ও ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com